বসন্ত রাগ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহাস্পদেষু

ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চ রথ এবং বিরাটকায় প্রস্তর হস্তী সমৃদ্ধ তীর্থস্থল মহাবলীপুরম ও উত্তরে মান্দ্রাজের কাছাকাছি একটি স্থান। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ। মান্দ্রাজ তখন নামে মাত্র শহর, প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে—প্রায় সমুদ্রতটে একটি সুন্দর তপোবনের মত আশ্রম। সুন্দর সুগঠিত,—কি বলব, বাড়ি? না, বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা নয়, তবে কুটির? না তাও নয়। কুটির বলতে যা বোঝায় তা থেকে অনেক সমৃদ্ধ; এবং বাড়ি বলতে যা বোঝায় তা থেকে আয়তনে আকারে স্থান-সঙ্কুলানে অনেক ছোট। চারটি পাথরের থামের মাথায় পাথরের ছাদের একটি ছয় হাত প্রস্থ বারো হাত দীর্ঘ বারান্দা, তার কোলে এমনি আয়তনেরই একখানি ঘরকে দুখানি করে নেওয়া হয়েছে; একখানি ছোট, একখানি বড়। সামনে ঘন বৃক্ষবেষ্টনীর মধ্যে কয়েক কাঠা পরিমিত জমিতে পরিচ্ছন্ন একটি উদ্যান। কিছু দূরেই নারিকেল তাল গাছের সুদীর্ঘ সারি, তারই কোলে মহাসমুদ্রের বেলাভূমি। গাঢ় কৃষ্ণাভ নীল সমুদ্র-তরঙ্গ সাদা ফেনা মাথায় নিয়ে কলকল্লোল তুলে আছড়ে এসে পড়ছে। তরঙ্গশীর্ষে রৌদ্রচ্ছটা ঝিকমিক করছে। অবিরাম কল্লোল ধ্বনিতে মুখরিত।

বারান্দায় ঘরে সজ্জার উপকরণ স্বল্প কিন্তু সেগুলি বড় সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। ছোট ঘরখানির পাশেই অল্প একটু, হয়তো বা দশ হাত পরিমিত স্থান তফাতে আর একখানি ঘর। নারিকেল পাতায় আচ্ছাদিত একখানি মাটির ঘর। বেশ সুগঠিত ও পরিচ্ছন্ন। সামনে দুটি হৃষ্টপুষ্ট ধবলাঙ্গী গাভী রোমন্থন করছে।

একটি আশ্রম, সত্যই একটি আশ্রম। নির্জন পরিবেষ্টনীর মধ্যে এমন মনোরম পরিচ্ছন্ন স্বল্পায়তন গৃহকে আশ্রম ছাড়া কিছু বলাও যায় না। আজ কিন্তু স্থানটি নির্জন নয়। বারান্দায় এবং বারান্দার সামনে উদ্যানের মধ্যে বহু জনের ভিড়। উত্তেজিত অথচ চাপা কোলাহল কোন অতিকায় মধুচক্রের উত্তেজনা-চঞ্চল মধুমক্ষিকার গুঞ্জন-ধ্বনির মত ধ্বনিত হচ্ছে। প্রতিটি লোকই মুখর—চাপা গলায় প্রত্যেকে কথা বলছেন। স্বর অনুচ্চ কিন্তু সুরে উত্তেজনা রয়েছে—উত্তপ্ত বায়ুস্পর্শের মত স্পষ্ট। কিন্তু একটি কথা বা শব্দও বোঝা যায় না—বহু জনের উচ্চারিত কথায় কথায় জড়িয়ে সব দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে এবং অদূরবর্তী সমুদ্র-কল্লোলের ধ্বনি তার উপর একটি আবরণ টেনে দিয়ে তাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলেছে। শুধু মনে হচ্ছে—একটি হায় হায় হায় হায় আক্ষেপ সব কিছুর মধ্যে। উদাস সমুদ্রের একটানা ধ্বনির মধ্যেও, এবং এই কথাবার্তার চাপা কণ্ঠস্বরের মধ্যেও।

জনতার পিছন দিকে দূরে আশ্রম-প্রবেশ-পথের বাঁদিকে—যে দিকে ঐ গাভী দুটি বাঁধা ছিল—সেই দিকে বিষণ্ণতায় যেন আচ্ছন্ন হয়ে ম্লান মুখে দাঁড়িয়েছিল শূদ্রকন্যা লল্লা। মনে হচ্ছিল যেন রৌদ্রতাপক্লিষ্ট একটি শ্যামলতা। রৌদ্রম্লান পাতার মত তার সারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ক্লিষ্টতার চিহ্ন। নির্বাক হয়ে সে শুনবার চেষ্টা করছিল, কে—কি বলছে!

এসেছে বহুজন। ব্রাহ্মণ শূদ্র—সকলেই কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান এবং বিদগ্ধজন। কারও প্রতিষ্ঠা বেশী, কারও কম। বৈদগ্ধ্যেও তাই। যার যেমন বেশী প্রতিষ্ঠা সে-ই তেমন আগে দাঁড়িয়েছে, স্বাভাবিক ভাবে। লল্লা দাঁড়িয়ে আছে একা—সকলের পিছনে।. সে-ই শুধু নির্বাক—শুধু শুনছে।

আরও একজন নির্বাক। অর্ধশায়িত অবস্থায় নির্বাক হয়ে শুয়ে আছেন—দক্ষিণের বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ সুকণ্ঠ গায়ক বীনকার রঙ্গনাথন,—বৈষ্ণব সঙ্গীতাচার্য রঙ্গনাথন। তিনিও নির্বাক হয়ে শুনছেন। তাঁর কপালে আঘাত-ক্ষতকে আবৃত করে বেশ পুরু কাপড়ের আবরণী বাঁধা, মুখ

চোখ ফুলেছে একটু। তিনিও ক্লিষ্ট।

তিনি আহত। তাই এত লোকের সমাগম। মহাগুণী আচার্য রঙ্গনাথন। সুরের জাদুকর। কণ্ঠস্বর বংশীধ্বনির মত। শুধু তাই নয়, নিজেই তিনি গীত রচনা করেন—নিজেই সুরারোপ করে বীণা বাজিয়ে গেয়ে বেড়ান। বড় বড় মন্দিরের প্রাঙ্গণে গিয়ে প্রথম তাঁর নূতন গান দেবতাকে শুনিয়ে আসেন; তারপর রাজার ধনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। মন্দিরের পুরোহিতেরা তাঁর নূতন গানের সংবাদ পেলেই তাঁকে নিমন্ত্রণ পাঠান; তিনি পত্রখানি মাথায় ধরে বলেন—শিরোধার্য—গিয়ে বলো, যথা সময়ে উপস্থিত হব। মন্দির-প্রাঙ্গণে আসর পড়ে, দীপাধারে উজ্জ্বল আলো জ্বালা হয়—তৈলদীপ, বর্তিকা, সুগন্ধি ধূপশলাকা জ্বলে। চারিপাশে হাজার হাজার শ্রোতা সমবেত হয়। নিয়মানুযায়ী শূদ্রেরা অচ্ছুতেরা দূরে দাঁড়িয়ে শোনে। তাঁর বীণা ঝঙ্কার দেওয়া মাত্রেই মোহের সঞ্চার হয় শ্রোতার মনে। বীণা মন্ত্রপূত নয়, ঝঙ্কারের মধ্যেও কোন জাদু নেই। কিন্তু তাঁর গান যাঁরা পূর্বে শুনেছেন—তাঁদের মনে জেগে ওঠে পূর্ব স্মৃতি; তাই করে মোহের সঞ্চার, যাঁরা নূতন তাঁদের মনে এর ছোঁয়াচ লাগে। তিনি আলাপ শুরু করেন। কণ্ঠস্বর—বীণার ঝঙ্কারের সঙ্গে মিশে কিন্তু সত্যই মোহ সৃষ্টি করে। স্বর এমন মধুর অথচ বলিষ্ঠ। ভারতবর্ষের সানাইয়ের সুর ওঠে যেন। তারপর গান শুরু হয়। গানও রঙ্গনাথনের নিজের রচনা। তাঁর মধ্যেও আছে এক নূতন ভাব ও ভাবনার প্রকাশ।

প্রতিবারই তাঁর বীণায় তিনি আঙুলের কৌশলে প্রথমেই শব্দ তোলেন—ঝম। যারা সঙ্গত করে তারাও করতাল ধ্বনিতে মৃদঙ্গ শব্দে অনুরূপ ধ্বনি মিশিয়ে দেয়। তারপর তিনি গেয়ে ওঠেন—অনাদি সৃষ্টির আদিতে নিস্তরঙ্গ শব্দের মধ্যে প্রথম নটরাজ চরণপাতে তাঁর নূপুর ঝঙ্কারের মধ্যে জন্ম নিল ধ্বনি। বিশ্বের সকল ধ্বনিই সঙ্গীত। প্রলয় তাণ্ডবের ভীম ভয়ঙ্কর নিনাদ থেকে ব্রজের বংশীধ্বনি, যুদ্ধক্ষেত্রের আর্তনাদ হুঙ্কার থেকে বেতসকুঞ্জে প্রণয়ী যুগলের মৃদু গুঞ্জন—আকাশের মেঘ গর্জনের বজ্রনাদ থেকে কোকিলের কুহুরব—সঙ্গীত-ঝঙ্কার সবের মধ্যেই। সব আছে এবং জন্ম নেয় নটনাথের নূপুরপাতে। হে নটনাথ—তা থেকেই প্রসাদস্বরূপ আহরণ করেছি এই যৎকিঞ্চিত সুর ও সঙ্গীতকণা। তাই আবার নিবেদন করি নটনাথ, নটরাজ, তোমারই চরণে।

এটুকু তাঁর প্রতিটি সঙ্গীতের বা তাঁর সঙ্গীত সাধনারই ভূমিকা। বঙ্গদেশে এমন ভূমিকার নাম চৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকে গৌরচন্দ্রিকা। ভারতীয় কাব্যশাস্ত্রে এর নাম বন্দনা। মহাভারতে ব্যাসদেব শুরু করেছেন—

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্—দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়োমুদীরয়েৎ।"

রঙ্গনাথনেরও এটুকু তাই। এদিক দিয়ে তিনি মহাভারতের অনুরাগী এবং মহাভারতকারের অনুসরণকারী। তারপর আরম্ভ হয় আসল গান। পুরাণ থেকে কাহিনী নিয়ে তিনি গান রচনা করে তাই গেয়ে থাকেন। পালা গানের মত। কিন্তু গায়ক তিনি একক। মধ্যে মধ্যে সূত্রধারের মত কাহিনীর সূত্রটি টেনে নিয়ে যান। আবার উপনীত হন সঙ্গীতে। যতক্ষণ গান করেন ততক্ষণ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ বা স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে থাকে। বুকের মধ্যে নানা ভাবতরঙ্গ অবিরাম উচ্ছ্বসিত হয়—করমণ্ডল বেলাভূমের সমুদ্রের মত। লোকেও তাই বলে। সমুদ্রতটবাসী মানুষগুলি সমুদ্রকে বড় ভালবাসে;—তারা সমুদ্র-শঙ্খের অলঙ্কার পরে, তাই দিয়ে কত শিল্প রচনা করে, তটভূমের নারিকেল ফল ও বৃক্ষ তাদের সম্পদ,—বেদনার আনন্দে তারা বেলাভূমে গিয়ে বসে, সমুদ্রকল্লোলে হৃদয়ের প্রতিধ্বনি শোনে, সমুদ্রের বাতাস তাদের নিদ্রা আনে, সমুদ্রের ঝড় তাদের ঘর উড়িয়ে ভাসিয়ে দেয়; সমুদ্রের নীলকজ্জল বর্ণের আভা তাদের অঙ্গলাবণ্যে

সুষমা সঞ্চার করে ; জীবনের উপমায় সমুদ্র তাদের রত্নাকর। সকালের সমুদ্র, দ্বিপ্রহরের সমুদ্র, সন্ধ্যার সমুদ্র, রাত্রের সমুদ্র, উচ্ছ্বসিত সমুদ্র, শান্ত সমুদ্রেই তাদের জীবনের প্রতিবিম্ব দেখতে তারা অভ্যস্ত। ভাবোচ্ছ্বসিত হৃদয়ের উপমা তাদের সমুদ্রে। রঙ্গানাথনের গান যখন তারা শোনে—তখন তাদের হৃদয়ের উপমা রাতের সমুদ্রের মত। শুধু তরঙ্গের পর তরঙ্গ। অন্য চিন্তার একটি নৌকাও তখন থাকে না। তারপর কখন গান শেষ করেন রঙ্গনাথন। বীণাটি পাশে রেখে দেন। হাত জোড় করে বলেন—ত্রুটি বিচ্যুতি সব ক্ষমা কর। আপনারাও করুন —আপনারা শ্রোতা, আপনারা দেবতা।

এতক্ষণে শ্রোতারা যেন মোহমুগ্ধতা থেকে মুক্ত হয়। তারা সমবেত স্বরে ধ্বনি দিয়ে ওঠে—জয় রঙ্গনাথন!

রঙ্গনাথন হাত তোলেন—না।

স্তব্ধ হয়ে যায় শ্রোতারা সবিস্ময়ে।

রঙ্গনাথন বলেন—না। বলুন—জয় বিশ্বরঙ্গ-পতি রঙ্গনাথন,—নটরাজ শিব জয়!

এই রঙ্গনাথন। লোকপ্রিয় রঙ্গনাথন। সুন্দর রঙ্গনাথন। মধুরপ্রকৃতি সঙ্গীতসাধক রঙ্গনাথন।

এই গুণী গীতিকার লোকপ্রিয় রঙ্গনাথন গত রাত্রে মান্দ্রাজ শহরে এক বর্ধিষ্ণু শ্রেণীর নিমন্ত্রণে গান করতে গিয়েছিলেন, কিরাতার্জুনীয় উপাখ্যান। প্রত্যাবর্তনের পথে একদল অজ্ঞাত আততায়ী পথের মধ্যে আক্রমণ করে তাঁর মাথায় আঘাত করেছে। তিনি আহত হয়েছেন। রাত্রের অন্ধকারে মাথায় আঘাত করে তারা অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। স্বল্প কয়েকজন সঙ্গী ছিল, তারা তাঁকে কোন রকমে বয়ে এখানে এনেছে।

ঘরের মধ্যে তিনি একখানি কাষ্ঠাসনের উপর বিছানো শয্যায় গোলাকার একটি উপাধানের উপর ঠেস দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় বসে আছেন। হাতের কাছে বীণাটি রয়েছে। একখানি হাত বীণার তারের উপর অলস বিশ্রামে পড়ে আছে। কপালের ক্ষতস্থান পরিচ্ছন্ন বস্ত্রখণ্ড দিয়ে বাঁধা। রক্তের একটি শীর্ণ রেখার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। রক্ত এখনও সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নি। সারা মুখে একটি বিষণ্ণ বেদনার ছায়া পড়েছে। দৃষ্টিও তাঁর উদাস বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন, সামনের জানালার ভিতর দিয়ে আকাশের নীলিমার মধ্যে যেন সান্ত্বনা খুঁজে ফিরছে। তাঁর শয্যার সামনে মেঝের উপর বিস্তৃত আসনে বসে আছেন এখানকার কয়েকজন অতিবিশিষ্ট ব্যক্তি। এখানকার শাসনকর্তার প্রতিনিধিও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। আরও যারা আছেন তাঁরা স্থানীয় বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী, বিশিষ্ট চিকিৎসক, কয়েকজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণও রয়েছেন, ব্রাহ্মণেরা স্বতন্ত্র আসনে বসে আছেন অবশ্য।

মৃদু স্বরে কথা চলছে ; একটি কথাই বিভিন্ন ভঙ্গিতে বলছেন সকলে—এ অরাজক। এতবড় অন্যায় আর হয় না। বর্বরতার চূড়ান্ত।

ব্রাহ্মণেরাও তাই বলছেন ; কিন্তু তাঁদের প্রকাশভঙ্গি অতি কঠোর, অতি রূঢ়। বলছেন —এ পাপ। মহাপাপ। বিধর্মী রাজশক্তির উদাসীনতাই এর কারণ। কিন্তু দেবতা ক্ষমা করবেন না।

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন প্রশ্ন করে উত্তরের প্রতীক্ষায় রঙ্গনাথনেরই মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন, কিন্তু রঙ্গনাথন সেই উদাস দৃষ্টিতে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তর হয়ে বসে আছেন। ব্রাহ্মণদের কথা শ্রীনিবাসনের কানে যেতেই তিনি ভ্রূ কুঞ্চিত করে আবার প্রশ্ন করলেন—বলুন আচার্য, আততায়ীদের কাউকেই কি আপনি চিনতে পারেন নি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রঙ্গনাথন ঘাড় নাড়লেন—না।

—কাল ছিল তিথিতে ত্রয়োদশী, আজ রাত্রে পূর্ণিমা, আকাশেও মেঘের লেশ ছিল না। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নার মধ্যেও আপনি চিনতে পারলেন না! আশ্চর্য!

পণ্ডিত চিদম্বরম এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন, এবার বলে উঠলেন—আপনি রাজপ্রতিনিধি হয়ে ব্রাহ্মণ-প্রকৃতি বিস্মৃত হয়েছেন শ্রীনিবাসন। রঙ্গনাথন ব্রাহ্মণ এবং গায়ক। সম্ভবত ভয়ে তাঁর চোখের সামনে গতরাত্রির এমন জ্যোৎস্নালোক গাঢ় অন্ধকারে পরিবর্তিত হয়েছিল। ভয়ে বোধ করি উনি চক্ষু মুদ্রিত করে ছিলেন।

তাঁর কথার মধ্যে শ্লেষ যেন রণ-রণ করছিল।

এবার একটু বিষণ্ণ হাস্যের সঙ্গে রঙ্গনাথন বললেন—আচার্য চিদম্বরম, অম্বর চিন্ময় হলে তাতে তার স্বরূপ আবৃত হয় না, কিন্তু মৃত্তিকা-জাত কার্পাস থেকে তৈরী বস্ত্রে তারা অতি সাবধানে তাদের স্বরূপকে আবৃত করে ছিল। এবং আমিও কিছু অন্যমনস্ক ছিলাম। সঙ্গীরা পশ্চাতে পড়েছিল। সুতরাং সঠিক চেনা তো সম্ভবপর হয় নি!

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন বললেন—তারা তো কিছু যেন বলেছিল আপনাকে! কি বলেছিল?

—হ্যাঁ বলেছিল। এই বিকৃত ব্যাখ্যা কোথা থেকে পেলে তুমি?

চিদম্বরম বললেন—তাদের বাক্যবিন্যাস—উচ্চারণ—

বাধা দিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—তাঁরা ব্রাহ্মণ নন আচার্য। অবশ্য গ্রাম্য মূর্খ ব্রাহ্মণের তো অভাব নেই দেশে। বাক্‌ভঙ্গি, উচ্চারণ দিয়ে সিদ্ধান্ত করা দুরূহ। কিন্তু তবুও তারা ব্রাহ্মণ নয়।

চিদম্বরম বললেন—সন্তুষ্ট হলাম রঙ্গনাথন। তোমার গানে তুমি পুরাণের যে ব্যাখ্যা করেছ তাতে তুমি আঘাত করেছ ব্রাহ্মণদেরই। তোমার প্রেম সহানুভূতি ওই সকল কৃষ্ণকায়দেরই উপর। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মূর্খ অবশ্যই আছে। তবুও তোমার এই সিদ্ধান্তের জন্য আমি প্রীত। তার কারণ এ নয় যে তুমি ব্রাহ্মণদের সন্দেহ কর নি—নিছক প্রীতির বশে বা ভয়ে। ব্রাহ্মণ-প্রকৃতির সত্য তুমি উপলব্ধি করেছ।

শ্রীনিবাসন বললেন—আপনি কি কাউকে সন্দেহ করেন না? কণ্ঠস্বর আকার আয়তন এগুলি তো বস্ত্রাবরণের ছদ্মবেশে ঢাকা যায় না!

বেশ একটু চিন্তা করে নিয়েই যেন রঙ্গনাথন বললেন—না।

দৃষ্টি তাঁর সেই জানালা দিয়েই বাইরে নিবদ্ধ। বাইরে গোশালার ধারে বিষণ্ণ ক্লিষ্ট শ্যামলতার মত শূদ্রকন্যাটি গোশালার কাঠের খুঁটিটা ধরে দাঁড়িয়েই আছে। বিষণ্ণ বেদনাচ্ছন্ন মুখ—চোখে যেন জল টলটল করছে। তিনি ওকে চেনেন। বড় ভাল মেয়ে। এখান থেকে অল্প দূরেই ওদের বাস। কন্যাটি সুকণ্ঠী। অন্ধ মায়ের হাত ধরে গান গেয়ে ভিক্ষা করে বেড়াত এই কিছুদিন পূর্বে পর্যন্ত। তাঁর সম্মুখে বা কাছে বিশেষ আসে নি। ভয়ে আসে নি—অধর্মের ভয়, শাসনের ভয় এবং লজ্জার ভয়ও বটে। গান তাঁর সামনেও কখনও গায় নি। এই সুকণ্ঠী কিশোরীর দূরাগত সঙ্গীতধ্বনি শুনে তাঁরও কখনও কখনও ইচ্ছা হয়েছে ডেকে ওর গান শোনেন। কিন্তু সামাজিক অনুশাসন এবং মর্যাদার সঙ্কোচে ডাকতে পারেন নি। তার দু-চারদিন পরই হয়তো বিস্মৃত হয়েছেন। এক মাস আগে সমুদ্রতটে একদিন ওর সঙ্গে ক'টি কথা বলেছিলেন। তারপর আর এদিকে আসে নি। কাল রাত্রে ওকে দেখেছিলেন। গানের সময় অনেক দূরে চত্বরের বাইরে জনতার প্রথম শ্রেণীতে একটি কাঠের দীপদণ্ডের সামনেই যেন ও দাঁড়িয়ে ছিল।

তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ওর চোখের অশ্রুধারা। আজও এসেছে—তাঁর আঘাতের কথা শুনেই এসেছে। নইলে এতটা নিকটে তাঁর আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করে গোশালার খুঁটি ধরে ও দাঁড়াতে সাহস করত না। আজও ওর চোখে জল।

শ্রীনিবাসন বললেন—এ না—কি না রঙ্গনাথন? আমি বললাম মানুষের কণ্ঠস্বর আকার আয়তন এগুলি বস্ত্রাবরণের ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে না। আপনি 'না' বলে তাই সমর্থন করেছেন?,

রঙ্গনাথন বললেন—মাননীয় শ্রীনিবাসন, আমি আপনার দুটি বাক্যাংশের উত্তরেই না বলেছি। আপনার যুক্তি সত্য—ছদ্মবেশে আকার আয়তন ঢাকা যায় না; একে সমর্থন করেও বলেছি—না। আবার কাউকে সন্দেহ করি কি না এর উত্তরেও বলেছি—না, কাউকে সন্দেহ করি না।

চিদম্বরম বললেন—অজ্ঞাত আঘাতকারী এবং রঙ্গনাথন অসাধুতার এবং সাধুতার দুই দূরতম প্রান্তে অবস্থান করেন শ্রীনিবাসন। রেখাটি কাল অকস্মাৎ গোলাকার হতেই মুহূর্তের জন্য পরস্পরের নিকটতম স্থানে পৌঁছে সংঘর্ষ হয়েছে—তারপরই আবার সরলরেখায় দূরতম প্রান্তে চলে গেছে। সুতরাং সাধুতার উচ্চতম বা শেষতম বিন্দুতে স্থিত রঙ্গনাথন অসাধুতম ব্যক্তিকে দেখেও চেনেন নি, কণ্ঠস্বর শুনেও শোনেন নি, জেনেও জানেন না। অবান্তর প্রশ্নে লাভ নেই।

রঙ্গনাথন এবার বললেন—আচার্য চিদম্বরম, প্রণাম আপনাকে, অনুমান অভ্রান্ত আপনার। শুধু আমি সাধুতার শেষতম বা উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁচেছি এই কথাটির প্রতিবাদ করি। আচার্য, যে পাণ্ডিত্য সাধুতার শেষতম বিন্দুর পথ বলে দেয়—তা আমার নেই। বোধ করি আপনি ওই বিন্দুতে থেকে পথের মাঝখানের যে রেখাটি ঠিক সন্দেহের গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে না—তার অন্তরটি দেখতেও পারছেন না, বুঝতেও পারছেন না। আচার্য, আঘাত আমার সত্য। বেদনা দুঃখ সত্য। রক্তপাত তার সাক্ষী। যারা মেরেছে তারা ব্রাহ্মণ নয় এও সত্য। কিন্তু তারা মারলে কেন আমাকে? আমি তো তাদের আঘাত করি নি। আমার শত্রু বলে কাউকে তো মনে করতে পারছি না।

—তুমি উদার। তাই বা কেন—উদারতম ব্যক্তি। তুমি শবর চণ্ডালও ব্রহ্মবিদ হতে পারে বলে বিশ্বাস করেছ।

—আমি মহাভারত থেকে উপাখ্যান নিয়েছি আচার্য। মহর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং এ সত্য মহাভারতের অঙ্গীভূত করেছেন। কেবল দুটি বিভিন্ন অংশকে আমি একত্রিত করেছি। কিরাতার্জুনীয় উপাখ্যানের আগে ধর্ম ব্যাধ উপাখ্যানের সারমর্মটুকু ভূমিকাস্বরূপ জুড়ে দিয়েছি।

—কিন্তু তার ব্যাখ্যা সে তোমার নিজস্ব। "কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে যিনি বসবাস করেন তিনিই বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে। যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বাস করেন শবর পল্লীতে, সকল পতিত পল্লীতে, ওই ওদের মধ্যে ওদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে। কৈলাসে যিনি বাস করেন ভবানীপতি, তিনিই আছেন ওদের মধ্যে। ওদের কৃষ্ণচর্ম দেখে যদি তোমার ঘৃণা হয়, ওদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতায়, কটু গন্ধে যদি তোমার দ্বিধা হয় কাছে যেতে, তবে তোমার জানা হবে না তাঁকে। ব্রাহ্মণ তনয়, তুমি ব্রহ্মাভিলাষী—ক্রোধে ঘৃণায় অহঙ্কারে শিক্ষার মধ্যে তোমার জানা হয় নি ব্রহ্মকে। আমি নারী, আমার ধর্মে আমি অধিষ্ঠিতা। আমার যিনি পতি তিনি শুধু আমার পূজ্যই নন তিনি আমার প্রিয়, প্রিয়তম। তাঁর সেবা আমার ধর্মই শুধু

নয়, সেই আমার জীবনধর্ম, সে-ই আনন্দ যার স্বাদে আর ব্রহ্মের স্বাদে প্রভেদ নেই। তুমি তাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হলে। সে ক্রোধে কোন ক্ষতি হয় নি বা হবে না আমার। সুতরাং তোমার পরম সত্য পরম তত্ত্বকে জানা সম্পূর্ণ হবে ব্যাধ-পল্লীতে ব্যাধ-ধর্মে অধিষ্ঠিত ধর্ম ব্যাধের কাছে। ঘৃণা করো না, নাসিকা কুঞ্চন করে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থেকো না, প্রবেশ করো। তুমি কি জান ভবানীপতি মহারুদ্র কিরাত রূপেই দেখা দিয়েছিলেন তপস্যাপরায়ণ অর্জুনকে? অর্জুন কিরাত বলে অবজ্ঞা করেছিল, ঘৃণাও করেছিল, কিরাতরূপী ভগবান তাঁর সে শক্তির অবজ্ঞা চূর্ণ করেছিলেন। হিমগিরির কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণচ্ছটায় প্রতিভাত স্বর্ণকান্তি কিরাত নীলগিরিতে যখন আসেন তখন তিনি সুনীল সমুদ্রলাবণ্যে অবগাহন করে হন নিবিড় নীলকান্তি।" এ তো তোমারই ব্যাখ্যা রঙ্গনাথন।

—আমি কি ভ্রান্ত বা বিকৃত ব্যাখ্যা করেছি আচার্য?

—সে কথা তুমি খৃষ্টান পাদ্রীদের জিজ্ঞাসা কর রঙ্গনাথন।

শ্রীনিবাসন বললেন—এর মধ্যে খৃষ্টান পাদ্রীদের কথা তুলছেন কেন আচার্য চিদম্বরম?

চিদম্বরম বললেন—তার কারণ কি, রাজপ্রতিনিধি আপনি, আপনার সুবিদিত নয় শ্রীনিবাসন? মান্দ্রাজের চারিপাশ, সারা তেলেঙ্গানা ওদিকে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন আজ তারা গির্জা গড়ে বসেছে। মান্দ্রাজে তারা সুপ্রতিষ্ঠিত। মহারাষ্ট্র-শক্তি পানিপথে প্রায় শেষ। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল নানা ফড়নবীশের মৃত্যুতে তাও গেল। তিন বছর যেতে না যেতে পেশোয়া ইংরেজের কাছে অধীনতার খত লিখেছে। মহীশূরে সুলতান টিপু বিগত। সুলতান টিপু হিন্দু-ধর্মের বন্ধু ছিল না, কিন্তু পাদ্রীদেরও কঠোর শাসনে শাসিত রেখেছিল। নিজাম আজ অক্ষম। দক্ষিণে ইসলাম তিন শত বৎসরেও সনাতন ধর্মের ক্ষতি করতে পারে নি। কিন্তু খৃষ্টান ধর্মের প্রসার দেখ। এরা যে কৌশলে ধর্মের প্রসার করে সে তো কারো অবিদিত নেই। তার উপর এই নিষ্কণ্টক অবস্থায় তারা অতি উগ্রভাবে ধর্ম প্রসারে শক্তি নিয়োগ করেছে। তারা অস্পৃশ্যদের এই পন্থায় বিদ্রোহী করে তুলে পরিশেষে তাদের খৃষ্টান করছে। সুতরাং কারণটা তুমি সম্ভবত জেনেও অস্বীকার করছ।

শ্রীনিবাসন বললেন—এ সব আলোচনা রাজনৈতিক আচার্য। অস্বীকার করছি না যে, এ আলোচনায় আমার অধিকার নেই। তবু অপরাধীকে জানতে পারলে শাস্তি নিশ্চয় দেব।

চিদম্বরম বললেন—কারণবশতঃ কার্য হয় শ্রীনিবাসন; কিন্তু ওই কারণটিও স্বয়ম্ভুর মত তার পূর্ববর্তী কোন কার্য বা কারণ ভিন্ন উদ্ভূত হয় না। এ আঘাত করেছে অস্পৃশ্যরা এবং অস্পৃশ্যদের উত্তেজিত করেছে ওই খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা। রঙ্গনাথন যে ব্যাখ্যা করেছে তার গানের মধ্যে, তাকে বিকৃত করে বুঝিয়েছে ওই পাদ্রীরাই। এ সংবাদ আমি নিশ্চিতরূপে জানি। অপরাধীকে আবিষ্কার করলেও তোমাকে প্রসারিত হস্ত সঙ্কুচিত করতে হবে শ্রীনিবাসন।

শ্রীনিবাসন বললেন—আমি প্রতিজ্ঞা করে যাচ্ছি, আমি তাদের আবিষ্কার করব, শাস্তি দেব। শুধু রঙ্গনাথনকে বলতে হবে—আমি চিনেছি, আকার আয়তন কণ্ঠস্বর এক—শুধু এইটুকু। সকলের সম্মুখে এ আমি শপথ করছি। তারপর রাজপ্রতিনিধিত্ব পরিত্যাগ করতে হলে তাও করব আমি।

সকলে একবাক্যে বলে উঠল—সাধু সাধু সাধু।

ওপাশে বসেছিলেন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী গোপালন। তিনি বললেন, আততায়ীর নাম বা সন্ধান তিন দিনের মধ্যে আমি আপনাকে দেব মাননীয় শ্রীনিবাসন। আমি ব্যবসায়ী—আমার দোকানে বহুলোকের সমাগম হয়, বহুজন কর্ম করে। এ সন্ধান পেতে আমার দেরি হবে না।

তবে আচার্য চিদম্বরমের কথা সম্পূর্ণ সত্য। এ কথা আমিও জানি। আচার্য রঙ্গনাথন এই গান করেন প্রথম কাঞ্জীভরমে। তাঁর ব্যাখ্যা বহু উচ্চবর্ণের জ্ঞানী-গুণীর কাছে প্রীতিদায়ক হয় নি, ব্যথিত হয়েছেন—বলেছেন, এ তত্ত্ব, এ ব্যাখ্যা সকলের জন্য নয়; তবু অস্বীকার করেন নি, সাধুবাদ উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু শবরদের মধ্যে এ ব্যাখ্যা ক্ষোভের কারণ হয়েছে। আপনারা বর্ধিষ্ণু শবর ব্যবসায়ী খৃষ্টান যোশেফকে জানেন? খৃষ্টান হয়েছে—ইংরাজী ভাষা শিখেছে—তবু সে যে শবর সে কথা ভুলতে পারে নি। সেও বোধ হয় কাঞ্জীভরমে গিয়েছিল গান শুনতে। আমার কাছে কিছুদিন আগে সে নারিকেল আর নারিকেল দড়ির চালান এনেছিল। রঙ্গনাথনের গানের কথাই আলোচনা হচ্ছিল। আমরা সকলেই প্রশংসা করছিলাম একবাক্যে। অপূর্ব এবং হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যা। যোশেফের মুখ চোখ ক্ষোভে কঠিন হয়ে উঠল। বললে, কুৎসিৎ, কুৎসিৎ—শেঠ গোপালন, অতি কুৎসিৎ ব্যাখ্যা। অতি সুকৌশলে আমাদের জাতিকে হেয় করা অবজ্ঞা করা ছাড়া আর কিছু নয়। কোথায় আমাদের পল্লীতে আবর্জনা, কোথায় দুর্গন্ধ? রঙ্গনাথন এতে ঈশ্বরের দয়া পাবে না, তাঁর কাছে শাস্তি পাবে। এ আমি নিশ্চিত বলে দিলাম—তুমি দেখো। হাতের মুষ্টিটা দৃঢ়বদ্ধ করে বললে, আমরা শবর থেকে খৃষ্টান হয়েছি, তবুও আমরা শবর। এই উক্তি এবং তার সঙ্গে এই দুর্ঘটনার এলাকা, তার সঙ্গে আঘাতকারীরা ব্রাহ্মণ নয়—

ঘরের সামনের বারান্দা থেকে কেউ বললে—ব্রাহ্মণ এবং শবর ছাড়া কি আর কারুর বা কাদেরও দ্বারা এ কাজ হতে পারে না শ্রেষ্ঠী গোপালন?

—কে? আলি নাসের সাহেব—

—হ্যাঁ, আমি।

—আপনি এসেছেন? তা বাইরে কেন?

—ভিতরে স্থান সংকীর্ণ। বাইরেই রয়েছি। রঙ্গনাথন আমার বড় প্রিয় গায়ক। আমি মুসলমান হলেও এসব পালাগান শুনতে ভালবাসি। যেদিন বিষ্ণুকাঞ্চীতে রঙ্গনাথন এই গান প্রথম করেন সেদিন আমি ব্যবসায়সূত্রে ওখানে গিয়েছিলাম। রাত্রেও ছিলাম। সেখানে শিবকাঞ্চীর একদল আধা সন্ন্যাসী ভক্তের আলোচনা আমি শুনে এসেছি। আমাকে তারা গ্রাহ্য করে নি। তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল, এর জন্য রঙ্গনাথনের শাস্তি বিধান করবে তারা। বৈষ্ণব ধর্মের এই একাকার করার পন্থার প্রতি, রঙ্গনাথনের ব্যাখ্যার প্রতি তাদের আর ঘৃণার শেষ ছিল না।

তাঁর কথায় ঘরের ভিতরের প্রত্যেকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একদল অর্ধোন্মাদ কোপন স্বভাবের ভক্ত আছে বটে।

শ্রীনিবাসন বললেন আচার্য চিদম্বরমকে—আচার্য!

আচার্য চিদম্বরম বললেন—হ্যাঁ, শুনলাম। একটু স্তব্ধ থেকে আবার বললেন—অসম্ভব নয় শ্রীনিবাসন। আমাদের গুণ-বারিধির সীমা পরিসীমা নেই। ধর্মে ধর্মে বিরোধ সে ছেড়েই দিলাম। ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের মধ্যে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধও অনির্বাণ অগ্নিকুণ্ডের মত জ্বলছে। রঙ্গনাথন ধর্মের অগ্নিতে হবি দিতে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিরোধের বহ্নিও জ্বলে উঠে থাকতে পারে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তা হলে আকার আয়তন কণ্ঠস্বর বাক্‌বিন্যাস থেকে রঙ্গনাথনকে কষ্ট করে আততায়ীর স্বরূপ অনুমান করতে হবে না। তাদের গাত্রগন্ধ থেকেই অনুমান হবে সর্বাগ্রে। তাদের গায়ের একটি গন্ধ আছে—যেমন বৈষ্ণবেরও আছে। রঙ্গনাথন—

শ্রেষ্ঠী গোপালন বললেন—শৈব অর্ধোন্মাদদের সন্দেহ করে খৃষ্টান যোশেফ এবং পাদ্রীদের ছেড়ে দেওয়া অনেকটা নিরাপদও হবে।

শ্রীনিবাসন বললেন—নিরাপত্তার কথা পরে শ্রেষ্ঠী গোপালন। আগে আচার্য রঙ্গনাথন বলুন।

রঙ্গনাথন বললেন—গন্ধের কথা স্মরণ করতে পারছি না রাজপ্রতিনিধি। তবে হতে পারে না এমন কথা বলতে পারি না। এবং এর পর সনাতনধর্মী মূর্খ গোঁড়ার দলই যে হতে পারে না তাই বা কেমন করে বলব আচার্য চিদম্বরম, আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি।

চিদম্বরম বললেন—রঙ্গনাথন, ভালই বলেছ তুমি। তুমি উদার।

ঠিক এই মুহূর্তে একজন বারান্দা থেকে ঘরে প্রবেশ করল এবং অতি সন্তর্পণে দেওয়ালের প্রান্তভাগ ঘেঁষে গোপালনের কাছে গিয়ে অতি মৃদুস্বরে প্রায় কানে কানে কিছু বললে।

গোপালন চমকে উঠে বললেন—কই, কোথায়?

—ওই যে গোশালার কাঠের খুঁটি ধরে। জানালার দিকে আঙুল বাড়িয়ে সেও সবিস্ময়ে বলে উঠল—কই! ওই তো ওইখানেই তো দাঁড়িয়েছিল। কই!

সকলেই বিস্ময়ভরে প্রশ্ন করলেন—কে? কি?

—যোশেফদের গ্রামের একটি মেয়ে। লল্লা বলে একটি মেয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করে, সেই-ই। ওই গোশালার খুঁটি ধরে সেই সকাল থেকেই ওখানে দাঁড়িয়েছিল। আপনাদের কথা শুনে আমি ভিতরে বলতে এসেছি—আর দেখি নি। আমার সন্দেহ হয়েছিল এই কথাগুলি শুনে অবশ্য যে ও এখানে এসেছে সংবাদ সংগ্রহের জন্য। তাহলে ঠিক তাই।

রাজপ্রতিনিধি শ্রীনিবাসন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উঠে পড়লেন এবং ঘরের বাইরে এসে ডাকলেন—থিরুমল!

কোতোয়ালীর কর্মচারী থিরুমল এসে সম্ভ্রমভরে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

—দেখ তো থিরুমল, এই স্থানটি তন্ন তন্ন করে সন্ধান করে দেখ—এখানে লল্লা বলে কোন শবরকন্যা—

—গান গেয়ে সে তো তার অন্ধ মায়ের হাত ধরে ভিক্ষা করে বেড়াত। তাকে তো চিনি। সে তো এখানেই ছিলো। ওইখানে ওই গোশালার ধারে।

—খোঁজ। তাকে খোঁজ। বের কর তাকে। সত্বর কাউকে আশ্রমের বাইরে পাঠাও দেখি।

রঙ্গনাথন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বললেন—আচার্য, রাজপ্রতিনিধি, এ কী করছেন? এই-খানেই বসে আমি দেখেছি একটি ম্লানমুখী শবর বালিকা গোশালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু সে কী অপরাধ করলে রাজপ্রতিনিধি?

রাজপ্রতিনিধি বললেন—আমার কর্তব্যকর্মে বাধা আপনি দেবেন না রঙ্গনাথন। আপনি সরল—

আচার্য বললেন—সরল নয়, নির্বোধ।

রঙ্গনাথনকে চুপ করতে হল।

থিরুমল তার চৌকিদারদের নিয়ে তল্লাস শুরু করলে। গোশালার অভ্যন্তর ঘরের মাচান, বাইরে প্রতিটি গাছের আড়াল—গাছের ঘন পল্লব ভেদ করে শাখাপ্রশাখায় দৃষ্টি সঞ্চালন করে দেখলে কোথায় গেল। তাদের সঙ্গে সমবেত লোকেদেরও কিছু লোক যোগ দিলেন সন্ধানে। কই—কোথায়? আশ্রম থেকে বেরিয়ে চারপাশ তারা দেখলে—চারপাশে যতদূর দৃষ্টি যায়

দেখলে। কই—কোথায় ?

একজন বললে—বেলাভূমি তো দেখা হয় নি !

ছুটে গেল একজন। তার পিছন পিছন আরও কয়েকজন। বেলাভূমি নির্জন। ঝিনুক শামুক বিকীর্ণ—দূর সুদূর মনে হয়। দিগন্ত পর্যন্ত বালুতট চলে গেছে। কোলে কোলে অশান্ত গাঢ় নীল সমুদ্র গর্জন করে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। দুরন্ত বাতাস নিরন্তর ক্রন্দন করে বয়ে চলছে হা হা করে। একদল উপকূলবর্তী নারিকেল তালের সারির অন্তরালে যথাসম্ভব সন্ধান করলে। কিন্তু কই ? সে কোথায় ? নেই তো !

শ্রীনিবাসন বললেন—আমি এর প্রতিকার করবই ! অপরাধীকে দণ্ড দেবই। সকলজনের সম্মুখে দেবতা সাক্ষী করে শপথ করলাম আমি। সে তারা যে-ই হোক। শৈব অর্ধোন্মাদ অথবা খৃষ্টান প্রচারক নিয়োজিত নির্বোধ যোশেক—যেই হোক।

আচার্য চিদম্বরম বললেন—শ্রীনিবাস তোমার সংকল্পে দেবতা এবং ধর্ম তোমাকে সাহায্য করবেন। শুধু—। রঙ্গনাথন !

—আচার্য !

—তোমাকে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে।

—সত্য বাক্য বলব আমি আচার্য। সত্যে স্থিতির চেয়ে তো দৃঢ়তা আর হতে পারে না আচার্য !

—হ্যাঁ রঙ্গনাথন ; মহাভারতে আছে—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামা হত উচ্চকণ্ঠে বলে নিম্নকণ্ঠে ইতি গজ বলে সত্য বলার নীতির নিয়ম রক্ষা করেছিলেন কিন্তু ধর্ম তাঁকে ক্ষমা করে নি। তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। মনে রেখো। চল শ্রীনিবাসন।

শ্রীনিবাসন বলেন—এখানে প্রহরার জন্য জন দুয়েককে রেখে যাই।

রঙ্গনাথন হাত জোড় করে বললেন—মার্জনা করুন রাজপ্রতিনিধি। তার চেয়ে আমার মৃত্যুই শ্রেয়।

শ্রীনিবাসন সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। রঙ্গনাথন বললেন—কতদিন আমাকে প্রহরাধীনে রেখে রক্ষা করবেন আপনি ? অসম্মান করবার জন্য কথাটা বলি নি আমি। আপনি চিন্তা করে দেখুন।

শ্রীনিবাসন উত্তর দিলেন না। প্রহরীদের নিয়ে তিনি চলে গেলেন। তাঁর সঙ্গে শ্রেষ্ঠী গোপালন, আচার্য চিদম্বরম এবং তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপর সকলেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশ্রম প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল।

রঙ্গনাথন আশ্রমে একরকম একাই বাস করেন। জীবন তাঁর বিচিত্র। ব্রাহ্মণের সন্তান কিন্তু শাস্ত্রবিদ্ বা পণ্ডিত তিনি নন। নিতান্ত বাল্যকালে পিতামাতৃহীন হয়ে অনাথে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁকে পালন করেছিলেন একজন বৈষ্ণব সাধু। রঙ্গনাথনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি—রঙ্গনাথনের সুস্বর এবং সঙ্গীতে জন্মগত অনুরাগ ও অধিকার দেখে। তিনিই তাঁকে গান শিখিয়েছিলেন। এবং পুরাণ কথা মুখে বলে শুনিয়ে পুরাণে পারঙ্গম করে তুলেছিলেন। তারপর পাঠিয়েছিলেন কর্ণাটক সঙ্গীতের একজন কর্ণধারের কাছে। ভক্তিবাদী বৈষ্ণব সাধুর তিনি ছিলেন ভক্ত। বালকের অনুরাগ, অধিকার এবং সুস্বর দেখে তো মুগ্ধ তিনি হয়েই ছিলেন—কিন্তু তারও থেকে বেশী মুগ্ধ তাঁকে করেছিল বালকের হৃদয়ের মমতার তৃষ্ণা। মমতার কাঙাল ছিল। শুধু পাবার জন্যই নয়, তার আপন মমতা রাখবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে

আধার খুঁজে সে ফিরত। ক্রমে তার সঙ্গীত-রচনার শক্তি স্ফুরিত হল,—তখন সে যুবা; সঙ্গীত-গুরু তখন তাকে বিদায় দিলেন; পাঠিয়ে দিলেন বৈষ্ণব সাধুর কাছে। তাঁকে জানিয়ে ছিলেন এর পর নিজের পথ সে নিজেই করে নেবে। এখন শুধু চাই এর জীবনের সঞ্চয় রাখবার একটি আধার। আপনি নিজে পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন।

কথাটা সত্য। এক গানের সময় ছাড়া বাকী সময় সে এক নিরবচ্ছিন্ন উদাসীনতায় মগ্ন থাকত। বৈষ্ণব গুরু জিজ্ঞাসা করেছিলেন—এমন উদাসীন হয়ে তুমি কেন থাক রঙ্গনাথন?

তরুণ রঙ্গনাথন বলেছিলেন—জানি না প্রভু। হয়তো—

—হয়তো কি রঙ্গনাথন?

—ঠিক জানি না প্রভু, মনে হয় বড় একা আমি।

—তুমি সংসার কর রঙ্গনাথন। আমি আমার গৃহী শিষ্যদের বলি—তারা একটি সুন্দরী সুশীলা পাত্রী দেখে দেবে।

হাত জোড় করে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না প্রভু, না।

—কেন?

—সংসারে আমি অনুপযুক্ত। আমার ভয় করে।

—ভয় করে?

—হ্যাঁ প্রভু। বড় ভয় আমার। আপনি আমাকে পালন করেছেন। আপনি গুরু। আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলছি না।

গুরু অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে প্রশ্ন করেছিলেন—তোমার কিসে সবচেয়ে উল্লাস বোধ হয় বলো তো? নিজেকে বুঝে সন্ধান করে বল। কখনও কোন মুহূর্তেই তুমি এই উদাসীনতা থেকে মুক্তি পাও না? ক্ষণেকের জন্যও কি মনে হয় না তুমি আনন্দ বোধ করছ? তুমি খুশী?

অনেকক্ষণ পর রঙ্গনাথন বলেছিলেন—হ্যাঁ প্রভু, সঙ্গীত-গুরুর সঙ্গে কয়েকবার সঙ্গীতের বড় আসরে গান গাইবার সুযোগ পেয়েছিলাম। বহু শ্রোতা মুগ্ধ হয়ে যখন আমাকে সাধুবাদে অভিনন্দিত করেছিল তখন মনে হয়েছিল আমি সুখী।

—একলা বসে কখনও কি আনন্দ অনুভব কর না?

—করি প্রভু। সে বিচিত্র অবিশ্বাস্য কথা। কেঁদে আমি আনন্দ পাই। যখন "আমার কেউ নেই"—এই চিন্তা গাঢ় তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, তখন চোখ থেকে জল গড়িয়ে আসে আপনিই। আরও একটি কারণে কান্না আমার পায়—মানুষের দুঃখ দেখে।

গুরুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি বলেছিলেন—এইটিই আমার শেষ প্রশ্ন। বল রঙ্গনাথন যখন বিপদ হয়, দুঃখ খুব গভীর হয়—কাকে ডাকতে ইচ্ছে করে? কাকে মনে পড়ে? কার কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়?

—ঠিক জানি না। তবে বিপদে পড়লে আপনার কথা মনে পড়ে, মনে হয় আপনার কাছে গেলেই পরিত্রাণ পাব। কিন্তু দুঃখ গভীর হলে তো কাউকে মনে পড়ে না। মনে হয় আমি একা। কেউ নেই আমার।

কয়েকদিন পর গুরু তাকে ডেকে বলেছিলেন—রঙ্গনাথন, এ কয়েকদিন চিন্তা করে আমি দেখলাম। জীবনের আধেয় তোমার অমৃতের মত। সে অমৃত রাখবার স্বর্ণপাত্র নেই, পাচ্ছ না বলে তোমার এই বেদনা, এই দুঃখ। গানের প্রশংসায় তোমার আনন্দ। গানই হোক তোমার কর্ম; অনেক প্রশংসা পাবে—প্রতিষ্ঠা পাবে। সে সব যদি তুমি গোবিন্দ-চরণের

আধারে সঞ্চয় করতে পার তবে এই জন্মেই মুক্তি হবে তোমার।

সেই সাধনাই করে আসছেন রঙ্গনাথন। একাই চলেছেন তাঁর বীণাটি হাতে। তাঁর বাদকেরা আছে, প্রয়োজনমত আসে। না হলে একাই থাকেন। ঠিক একা নয়—পরিচারক আছে বৃদ্ধ কুড়ুমনি।

সঙ্গীতের জন্য তাঁর খ্যাতি হয়েছে। তাঁর গান হবে শুনলে সহস্র জনের সমাগম হয়। গানের সময় তাদের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে তাঁর বুক ভরে ওঠে আনন্দে। গুরুর কথা স্মরণ করে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে চোখ বুজে বলেন—তোমাতে অর্পণ করছি। গান-শেষে প্রসাদী মাল্য নিয়ে ফিরে আসেন; ধনীর গৃহ থেকে সম্মান-অর্থ নিয়ে ফিরে আসেন; পথ থেকেই সে আনন্দ মিলিয়ে যেতে শুরু করে। বাড়ীতে এসে বীণাটি পাশে রেখে বসবার সঙ্গে সঙ্গেই উদাসীনতা আবার তাঁকে আশ্রয় করে। মাঝে মাঝে অন্যমনস্কতার মধ্যে তাঁর মধ্যমাঙ্গুলি বীণার তারে মৃদু আঘাত করে, মনে যেন ধ্বনি ওঠে—কেউ নেই তাঁর। বিগ্রহের মুখ স্মরণ করতে চেষ্টা করেন। স্মরণ হয় না, তার বদলে ভেসে ওঠে সপ্রশংস-দৃষ্টি কোন শ্রোতার মুখ। কখনও কখনও দুঃখীজনের মুখ মনে পড়ে। কোন ভিক্ষুক। কোন নিপীড়িত মানুষ। তার মধ্যে নারীর মুখও আছে। কিন্তু কোন বিশেষ একটি নারীর মুখ বার বার ভেসে ওঠে না। কিছুদিন থেকে তাঁর মনকে আলোড়িত করেছে এই শবরদের দুঃখ। কিছুদিন আগে তিনি মহাবলীপুরমে সমুদ্রতটভূমি ধরে পদযাত্রা করেছিলেন উত্তরমুখে। এই উদাসীনতা-যেন হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলের কুয়াশা ও ঘন শীতে বরফ হয়ে জমে স্তূপীকৃত হয়ে তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। অনেক বেদনাতুরতা ও ভারাক্রান্ততার পর একদিন সারারাত্রি কেঁদে-ছিলেন। পরদিন তুষারাচ্ছন্ন জীবনভূমি ও নির্মল মানসাকাশ নিয়ে তিনি পড়তে বসেছিলেন মহাভারত। সাবিত্রী উপাখ্যান মনকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রধান কারণ মদ্ররাজ কন্যা মহীয়সী সাবিত্রী। মদ্ররাজ অশ্বপতির কন্যা। তিনি যাচ্ছিলেন মাল্যবান পর্বতবেষ্টিত পম্পা-সরোবর দেখতে এবং সেখানে স্নান করতে। ইচ্ছা ছিল সেখানে বসেই সাবিত্রী উপাখ্যান নিয়ে পালা গান রচনা করবেন। ওইখানেই আছে সেই মহামহিমময় ভূমি—যেখানে কৃষ্ণাচতুর্দশীর প্রগাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মৃত সত্যবানের মাথা কোলে রেখে বসে চোখে দেখেছিলেন কৃষ্ণ-জ্যোতিষ্মান মৃত্যুদেবতাকে। ইচ্ছা ছিল গভীর রাত্রে বনে বসে বীণা বাজিয়ে মনে মনে গেঁথে যাবেন সুর এবং কথা। কিন্তু তা হয় নি। হঠাৎ তিনি রুদ্ধগতি হয়ে গিয়েছিলেন একখানি শবরপল্লীতে। ঝড় উঠেছিল সমুদ্রে। আকাশ নিকষ কালো মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে এল, তার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়। সমুদ্র-বেলাভূমির বালুকণা উৎক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। ভেঙে পড়ছিল তাল নারিকেল শীর্ষ। শাখাপ্রশাখা সমন্বিত গাছ যেগুলি সেগুলির শাখা ভাঙছিল, পাতাগুলি ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে উড়ে যাচ্ছিল, মধ্যে মধ্যে দু'চারটি সমূলে উপড়ে গিয়ে মাটিতে অন্য গাছের উপর সবেগে আছড়ে পড়ছিল। উচ্ছ্বসিত সমুদ্রতরঙ্গ পাহাড়ের মত উঁচু আকার নিয়ে বেলাভূমি পার হয়ে স্থলভাগে এসে প্লাবন বইয়ে দিচ্ছিল। রঙ্গনাথন সমুদ্রকে পিছনে রেখে পশ্চিমমুখে স্থল-ভূমির অভ্যন্তরে আত্মরক্ষার জন্য প্রবেশ করবার চেষ্টা করেছিলেন। বহু কষ্টের পর একখানি শবরপল্লী পেয়ে বেঁচেছিলেন। কালটা দিনমান ছিল তাই পেয়েছিলেন—নইলে পেতেন না। নাতিউচ্চ পার্বত্য অঞ্চল। সবটাই ছোট ছোট গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তারই মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথ পেয়ে যথাসাধ্য দ্রুত যেতে যেতে হুঁচোট খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। জ্ঞান হলে দেখেছিলেন টোডা জাতীয় শবরদের পল্লীতে শুয়ে আছেন একটি ছোট কুটিরে। ঝড় তখন কেটে গেছে। ছোট গ্রাম, পনের-কুড়ি ঘর মানুষের বাস। কুটির নামেই কুটির। তৃণাচ্ছাদিত

কুঁড়ে। কৃষ্ণকায় সরল নরনারীর দল। বন থেকে জীবিকা সংগ্রহ করে। এদের দক্ষিণী রূপ রঙ্গনাথন দেখেছেন। উত্তরে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়েছিল সে রূপের। মেয়েরা বুকের উপরে কাপড় পরে। কাঁধ খোলা। পুরুষদের কাপড় সামান্য, কোমর থেকে জানু পর্যন্ত। তাও অনেকের নেই, সামান্য কৌপীন সম্বল। জ্ঞান যখন হয়েছিল তখন শিয়রে বসেছিল এক বৃদ্ধা। তাকে তিনি তামিল ভাষাতেই প্রশ্ন করেছিলেন—তোমরা আমাকে বাঁচিয়েছ?

প্রৌঢ়ার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, কথা সে বলতে পারে নি। এর পর খবর পেয়ে এসেছিল পল্লীর কর্তা। সে বলেছিল, বাঁচাবার মালিক তোমাকে বাঁচিয়েছে। আমরা অচেতন অবস্থায় তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। বাঁচবে সে আশা করি নি।

কর্তার পিছনে দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছিল পল্লীর সমস্ত লোক। প্রতিটি জনের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন আনন্দ এবং মমতায় মিশ্রিত প্রসন্ন দৃষ্টি। অকস্মাৎ পিছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ চীৎকার উঠেছিল। নারীকণ্ঠে কে চীৎকার করে বলেছিল—রক্ত রক্ত—ওর রক্ত নে। আমাদের রক্ত নিলে। নে নে। ছাড়্—পথ ছাড়্।

গ্রামের কর্তা চকিত হয়ে বলেছিল—যা যা, ওকে নিয়ে যা। এখানে এল কি করে? তারপর তাঁর বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলেন—ও পাগল।

সন্ধ্যার পর থেকে সারারাত চীৎকার করেছিল মেয়েটি। আতঙ্কের চীৎকার। যেন দলে দলে আততায়ীরা তাকে আক্রমণ করতে এসেছে। নিদারুণ আতঙ্কে চীৎকার করেছে।

কর্তা তার বীণাটি এনে পাশে রেখে বলেছিল—এটি আপনার পাশেই পড়েছিল।

—হ্যাঁ। আমার বীণা। ভেঙে গেছে, এতে আর কাজ হবে না। অক্ষত থাকলে গান শোনাতাম। তোমরা প্রাণ বাঁচিয়েছ।

—গান! কর্তার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তুমি গান গাও?

—হ্যাঁ গাই।

—আমাদের শোনাবে? আমরা গান ভালবাসি।

—তোমরা গান গাও না? মেয়েরা নাচে না?

—নাচত। গাইত। খুব ভাল। ওই পাগল মেয়েটা সবচেয়ে ভাল নাচত। ওটা আমার মেয়ে। কিন্তু—এখন পাগল। শুধু চেঁচায়। ওই চেঁচাচ্ছে, সারারাত চেঁচাবে। মাঝে মাঝে ঘুম আসে, হঠাৎ ঘুম ভাঙে আর চেঁচায়। এলো—এলো। ছেড়ে দে—ছেড়ে দে। ওর উপর বড় জুলুম করেছে। মরে যদি যেত—

রঙ্গনাথন কি উত্তর দেবেন? কি বলবেন? চুপ করে ছিলেন নির্বাক হয়ে। কিছুক্ষণ পর বলেছিলেন—গান গাইব? শুনবে? শুধু গলাতেই?

—গাও। গাও। সেটা ওরও ভাল লাগবে।

তিনি গেয়েছিলেন। ছোট একটি পালা গান। রামায়ণের—গুহক চণ্ডালের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিতালি।

ওই পাগলিনী এসে বসেছিল শান্ত হয়ে। সকলের পুরোভাগে বসেছিল। আশ্চর্য শ্রীময়ী মেয়ে। নিতান্ত তরুণ বয়স। কুড়ির নিচে।

গান শেষ হলে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিল—রামচন্দ্রের লোকেরা এসে ঘর পুড়িয়ে দিলে না?

কর্তা উদ্বিগ্ন হয়ে তাকে হাত ধরে বলেছিল—উন্নি, উন্নি—সীতারাম, সীতারাম। বলতে নাই। সীতারাম।

—হ্যাঁ। সীতারাম। ভগবান।

—হ্যাঁ। ভ-গ-বা-ন।

—ভগবান দুঃখ দেয় না। জবরদস্তি জুলুম করে না। মানুষ—মানুষে করে। তারপরই চীৎকার করে উঠেছিল—মরে যা। মানুষ মরে যা।

রাত্রে রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—উন্নি কেন ও-কথা বললে?

কর্তা তাকে বলেছিল সব কথা। এ গ্রাম তাদের সেই প্রাচীনকালের বাসভূমি নয়। তাদের বাস ছিল সমুদ্রের ধারে বন্দর শহরের কাছে—খানিকটা দূরে। একসঙ্গে তারা থাকত—প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার। জুলুম তাদের উপর হয়—হত। কিন্তু গত দু-বৎসরে মারাঠা নিজাম আংরেজদের লড়াই হয়েছে। সেই লড়াইয়ে তাদের গোটা গ্রামটা জ্বলেছে চারবার। দুবার জ্বালিয়েছে বর্গীরা, একবার ইংরেজ, একবার নিজাম। যার পথে যখন পড়েছে, সে জ্বালিয়েছে—জুলুম করেছে। ওই মেয়েটাকে—উন্নিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। ধরে রেখেছিল তিন দিন। তিন দিন পর যখন ছেড়ে দিলে—তখন ও পাগল। রাত্রি হলেই চীৎকার করে—না—না—না। ছেড়ে দে। ছেড়ে দে। মেরে ফেল্ মেরে ফেল্। সারারাত। দিনের বেলা নতুন লোক দেখলে ছুটে গিয়ে লুকোয়। লোকজন থাকলে তখন চেঁচায়—রক্ত নে, রক্ত নে। ওরা কেন রক্ত নিলে! আমাদের গ্রামে চারবারে তারা কুড়িজনের বেশী লোককে খুঁচিয়ে মেরেছে ও দেখেছে। সেই থেকে আমরা গ্রাম ছেড়ে এই বনে এসে ঘর বেঁধেছি। এই দেখ—এখনো ঘর-গুলান ভাল করতে পারি নি। ঝুপড়ি বেঁধে আছি। এখনও সব বলছে—ইখানেও নয়—চল—আরও বনের ভিতরে চল। যেখানে কেউ খোঁজ পাবে না।

রঙ্গনাথনের চোখ জলে ভরে উঠেছিল। সারারাত ঘুমোতে পারেন নি। পরের দিন তিনি তাদের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এসে মাল্যবান পম্পাসরোবরের দিকে পিছন ফিরে, ফিরে এসেছিলেন মান্দ্রাজের প্রান্তে তাঁর আশ্রমে।

মনের মধ্যে শুধুই ভেবেছিলেন এদের কথা। এই সরল মানুষ, দীন মানুষ, বঞ্চিত মানুষ, পদানত মানুষদের কথা। কেন? কেন এত অত্যাচার এদের উপর? কেন এত অবজ্ঞা? কেন এত ঘৃণা? মহাভারত মনে পড়েছিল।

মহাবলীপুরমে পাথরের বুকে খোদাই করা অর্জুনের তপস্যা-কাহিনী মনে পড়েছিল।* অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে স্বয়ং মহারুদ্র এসেছিলেন কিরাত বেশে—সঙ্গে এসেছিলেন কিরাত নারীবেশে স্বয়ং পার্বতী। এইটি অবলম্বন করেই তিনি নতুন গান রচনা করে বলবেন এরা সেই রুদ্রের বংশধর। অস্পৃশ্য নয়, পরম পবিত্র—বিপুল শক্তির অধিকারী। তারপর মনে পড়েছিল—ধর্মব্যাধের কথা, যাঁর কাছে গিয়েছিলেন ব্রাহ্মণ কুমার কৌশিক ব্রহ্মকে জানবার জন্য। তার কিছুটাও জুড়ে দিয়েছিলেন।

কৌশিককে ব্যাধের কাছে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এক পতিতা নারী। তিনিই বলেছিলেন—ঘৃণা নিয়ে যেয়ো না। মনে রেখো—ওই কৃষ্ণবর্ণ মানুষগুলির অন্তর-মন্দিরে যিনি বসবাস করেন—তাঁরই বসতি সর্বোচ্চ স্বর্গে, গোলক নিবাসে। এইটুকুই হয়েছিল ভূমিকা এবং এইটুকুই কিছু বিশদ করে হয়েছিল উপসংহার। পথেই শুরু হয়ে গিয়েছিল রচনা। ফিরে এসে রচনা করেছেন আর কেঁদেছেন। এই রচনার সময়েও একদিন তিনি ওই শবরকন্যা লল্লার দূরাগত সঙ্গীত শুনেছিলেন। ভগবানের স্তবগান করে বোধ হয় ভিক্ষা করছিল। কন্যাটি

* এখন এই খোদাই চিত্র ভগীরথের তপস্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে অর্জুনের তপস্যা নামেই পরিচিত ছিল।

বিচিত্র। শুনেছিলেন যোশেফের আপন জন, নাকি আপন জ্যেষ্ঠ সহোদরের কন্যা। এই ব্যবসায় আরম্ভ করেছিল লল্লারই বাপ। যোশেফ তখন যোশেফ হয় নি। তবে পাদ্রীদের কাছে যাতায়াত ওর অনেক দিন থেকেই। গীর্জার সংলগ্ন বাগানেও কাজ করত। বাড়ি থেকে ঝগড়া করে পালিয়ে গিয়েছিল। তারপর লল্লার বাপের মৃত্যুর পর গ্রামে ফিরে দাদার ব্যবসায়ের ভার নিয়েছিল। অল্প চার-পাঁচ বছরেই সে সমৃদ্ধ করে তুলেছে তার ব্যবসায়। এখন ব্যবসায় তার। এরই মধ্যে সে নিজে খৃষ্টান হয়েছে, তার গ্রামের আরও অনেককে খৃষ্টান হতে প্রলুব্ধ করেছে। মান্দ্রাজে কোম্পানীর চাকরি বড় প্রলোভন। তার সঙ্গে পোশাক, মর্যাদা—অনেক কিছু। হিন্দু-সমাজের যারা মাননীয়, যাদের সঙ্গে এক পথে হাঁটবার উপায় নেই, যাদের গায়ে কোনরকমে তাদের ছায়া পড়লে তাদের অপরাধ হয়—তাদের উপেক্ষা করার, অস্বীকার করার অধিকার পেয়ে ওরা প্রমত্ত উল্লাসে মেতে উঠেছে। মুক্তিও পেয়েছে বইকি। গ্রামে তাদের এখন পাদ্রীদের পাঠশালা হয়েছে। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে। লল্লাও শিক্ষা পেয়েছিল। তার মায়ের আপত্তিতেই ধর্মান্তর তারা গ্রহণ করে নি। নইলে—। না না, তা তো নয়। মেয়েটির গান শুনে তা তো মনে হয় না। মেয়েটি সুকণ্ঠী—তার ওপর ওই টোডা মেয়েটির—ওই উন্নির চেয়েও সুশ্রী। তার উপর একটি মার্জনা আছে। শিক্ষার মার্জনা—নগর বাসের মার্জনা। এই মেয়ে—। সে কি এইখানে এসেছিল সংবাদ সংগ্রহ করতে? তার চোখে যে জল তিনি দেখেছিলেন—তা কি শান্ত সমুদ্রের নিস্তরঙ্গতাকে বিষণ্ণতা ধরে নেওয়ার মত একটি কল্পনা! মাত্র স্বেচ্ছাকৃত ভ্রম! যোশেফও তাঁর অপরিচিত নয়। তার সঙ্গীরাও তাঁর পরিচিত। কতদিন তারা গান শুনে যায় তাঁর আশ্রমের সামনে ওই বেলাভূমে বসে। দেখা হলে প্রসন্ন হাসিতে ভরে ওঠে তাদের মুখ, চোখ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে জলন্ত প্রদীপের মত। অপরিমেয় ভালবাসা তারা ব্যক্ত করেছে সামান্যতম উপলক্ষে। আশ্রমের বাঁশের ফটকটির পাশে রেখে যায় ফুলের গুচ্ছ। সবুজ কাঁচা নারিকেল, পরিপুষ্ট কলা, অমৃত ফলের সময় অমৃত ফল—বাঁশের নতুন আধারে সাজিয়ে এসে ডাকে—আচার্য! আচার্য!

তিনি শুনতে পেলেই বাইরে এসে বলেন—এস। আমার এখানে কোন সঙ্কোচ নেই। এস।

তারা হাসিমুখে এসে পাত্রটি নামিয়ে দিয়ে বলে—আমার বৃক্ষের ফল। আপনার জন্য এনেছি।

তিনি তুলে নিয়ে বলেন—আজ আমার দেবতা পরম তৃপ্তিতে ভোজন করবেন ভদ্র।

রঙ্গনাথন তাদের ভদ্র ছাড়া সম্বোধন করেন না।

অবশ্য এসব আদান-প্রদান খৃষ্টান শবরদের সঙ্গেই বেশী হয়। খৃষ্টানেরাও আসে—যোশেফই এসেছে। সে একবার তাঁকে নারিকেল রজ্জুর সুন্দর পাপোশ তৈরী করে এনে দিয়ে গেছে। তার কণ্ঠস্বর সঙ্কোচহীন কিন্তু সহজ নয়। ওই সঙ্কোচ বর্জনের প্রয়াসেই কিছুটা যেন অস্বস্তিকর। ডেকে বলেছিল—সঙ্গীতাচার্য, রয়েছ নাকি?

—কে?

—আমি যোশেফ।

—এস এস।

—তোমার জন্য এই পাপোশটি নিয়ে এসেছি। দেখ তো, সুন্দর হয় নি?

—সুন্দর—সুন্দর হয়েছে ভদ্র।

—ভদ্র কেন বলছ। বল যোশেফ।

—বেশ তাই বলব।

—হ্যাঁ। আমি তো এখন একজন খৃষ্টান জেণ্টু। জান তো?

—হ্যাঁ জানি।

—আমি তোমাকে সঙ্গীতাচার্য রঙ্গনাথন বলব। কিছু মনে করবে না তো?

—না না। কেন মনে করব!

—এই কারণেই তোমার জন্যে এটি আনবার ইচ্ছা হল। ওই সব ব্রাহ্মণ আচার্যদের আমি এ সব দিই না। তারপর বলেছিল, জান সঙ্গীতাচার্য, তোমার গান শুনবার আমার ইচ্ছা হয়। কিন্তু আমরা অনেকেই তো প্রভু যীশুকে ভজনা করি। তাই ভয় হয় যদি প্রভু রুষ্ট হন। পাদ্রী বাবারা রুষ্ট হবেন এ নিশ্চিত। নইলে রীতিমত তোমার দক্ষিণা দিয়ে পালা গান শুনে একদিন আনন্দ করতাম। তুমি যেতে আচার্য?

একটু ভাবতে হয়েছিল তাঁকে। গেলে হয়তো উচ্চবর্ণের সমাজে, দেবমন্দিরে তাঁর প্রবেশপথ রুদ্ধ হতে পারে।

যোশেফ বলেছিল—তোমার ইচ্ছা আছে সে আমি জানি আচার্য। আমার মত তোমারও ভাবতে হচ্ছে পুরোহিত পণ্ডিত সমাজপতিদের কথা। হ্যাঁ, ভাবনার কথা।

—হ্যাঁ যোশেফ, ভাবছি তাই।

—থাক আচার্য। তোমার গান আমরা দূর থেকেই শুনব। কিন্তু তোমার গানে তুমি বড় বেশী কাঁদাও।

কালো মানুষটি শুভ্র সুন্দর সুগঠিত দুপাটি দন্ত বিস্তার করে হেসেছিল—আমরা হাসতে ভালবাসি। বলে সে চলে গিয়েছিল। যেতে যেতে আবার ফিরে এসে বলেছিল—আচ্ছা একটা কথা বলতে পার?

—কি বল।

—হাসতে ভালবাসি। তোমার গানে কাঁদতে হয়। তবু যাই। আর কেঁদেও সুখ হয়। কেন বল তো? হেসে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তোমারই মত—ওর উত্তর আমি জানি না যোশেফ।

—আমার ভাইঝি—সে খুব ভাল গান গায়। খুব ভাল কণ্ঠ। আর শুনেই শিখে নেয়! মধ্যে মধ্যে যখন মেজাজ খারাপ হয় ওকে ডাকি। গান গাইতে বলি। শুনে মেজাজ ভাল হয়।

—হ্যাঁ। দূর থেকে ওর গান শুনেছি আমি। সুন্দর কণ্ঠ।

—ওকে দেখেছ? সুন্দর দেখতে। ওকে আমাদের খৃষ্টান পাঠশালায় লেখাপড়াও শিখিয়েছি। দাদা মারা গেল। ভার তো আমার ওপর। ইচ্ছা ছিল ভাল লেখাপড়া শেখাব, খৃষ্টান করে দেব—ভাল বিয়ে হয়ে যাবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কত ছোকরা ইংরেজ কর্মচারী আসে। তারা এখানে বিয়ে করে। তা দাদা ছিল গোঁড়া আর কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ওর বউটা আরও বেশী। সেই মা-ই ওকে হতে দেয় নি খৃষ্টান। রাগ করে আমার কাছ থেকে একমুঠো চালও নিত না। ভিক্ষে করে খেতো। আমিও খুব কড়া লোক, খুব কড়া। আমিও দিই নি। তা ছাড়া আইনের ভয় আছে। জান তো, ও থেকেই ওরা বলতে পারে আমরা এক সংসার। সব কিছুতে তাদের ভাগ আছে। মেয়েটার বিয়ে হবে—জামাই দাবী করবে। ওর মা-টা অন্ধ হয়েছিল—মেয়ের হাত ধরে গান গেয়ে ভিক্ষে করত। রোজগার ভাল হত আচার্য। মেয়েটা এখন মায়ের গোঁড়ামি পেয়েছে। মা বলত, খৃষ্টান হতে কখনও দেব না।

তার চেয়ে কোনও মন্দিরে দিয়ে আসব, মন্দিরের চারপাশ ঝাড়ু দেবে, বাইরে দাঁড়িয়ে গান করবে—ওর গতি হয়ে যাবে।

অবাক হয়ে শুনেছিলেন রঙ্গনাথন। এ সবই নূতন কিছু নয়। শুনেছেন। তিনি বৈষ্ণব—কত অচ্ছুৎ ভক্ত জীবনে সন্ত হয়ে গেছে। কিন্তু এমন করে চোখের সামনে ঘটছে—অথচ জানেন না—এইটেতে বিস্ময় তাঁর।

যোশেফ বলেছিল—মেয়েটা নাচতেও পারে। এখন ওর ইচ্ছে ভাল করে নাচ শেখে, গান শেখে। কোন কথাকলির দলে ওকে দেওয়া যায় না আচার্য? তুমি একটু সাহায্য করতে পার না? ঠিক বলছি তোমাকে, লল্লা খুব নাম করবে। খুব ভাল পারবে।

এ সব ঠিক পম্পাসরোবর যাবার আগের কথা। পম্পাসরোবর যাবেন—স্নান করবেন—সাবিত্রীর উপাখ্যান নিয়ে পালা রচনা করবেন এই ভাবনার মধ্যে যোশেফ লল্লা এদের কথা মনেই পড়ে নি। পথে ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে টোডা গ্রাম থেকে ফিরে আসবার পথে কিন্তু ওই উন্নি মেয়েটির সঙ্গে লল্লার স্মৃতি জড়িয়ে গিয়েছিল। উন্নিকে মনে হলেই তার পিছনে লল্লা এসে দাঁড়াত। মনে হত লল্লার ভাগ্যেও হয়তো এমনই দুর্গতি লেখা আছে। ভেবেছিলেন যোশেফকে ডেকে বলবেন—যোসেফ, লল্লা তোমার ভাইঝি! দেশকাল তো দেখছ। আজ যুদ্ধ—কাল যুদ্ধ। রাজারা সব সামুদ্রিক ঝড়ে নারিকেল সুপারি বৃক্ষের মত পড়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে লল্লাকে এমন ভিক্ষা করে বেড়াতে দিয়ো না। ওর বিয়ে দাও। সংসারী করে দাও। পল্টনের সিপাহী—সে তোমার যেমন দেশী হিন্দু মুসলমান, তেমনি ফিরিঙ্গী। এদের কাছে আমরা সবাই দুর্বল। তার উপর মান্দ্রাজ নগর দিন দিন বড় হচ্ছে। নানান স্থানের ধনী আসছে, দুষ্ট আসছে। এরাও বর্বর। সংসারে মানুষ ভূমি আর নারীর প্রলোভনে জন্তু হয়ে যায়। কন্যাটির বিয়ে দিয়ে ওকে কিছুটা রক্ষা কর, নিরাপদ কর।

ভেবেছিলেন বলবেন, কিন্তু তাও ভুলে গেছেন। বলা হয় নি। যোশেফও এদিকে আসে নি। লল্লার কণ্ঠস্বর দূর থেকে তাঁর কানে আসে নি। তিনি নিজেও রচনার কাজে এমনি তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন যে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগ ছিল না।

লল্লাকে এরপর দেখেছিলেন কাঞ্জীভরমে—বরদরাজের মন্দিরচত্বরে এই গান প্রথম দেবতা ও সাধারণের সামনে গাইবার দিন। মন্দির প্রবেশপথে গোপুরমের বাইরে সে দাঁড়িয়েছিল অস্পৃশ্য শ্রোতাদের মধ্যে।

মেয়েটিকে দেখে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ কি লল্লা নয়? হাতে করতাল, কাঁধে ভিক্ষার ঝোলা? রঙ কৃষ্ণবর্ণ নয়, শ্যামবর্ণ। সুন্দর মুখশ্রী। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী। পরনের হরিদ্রাবর্ণ মোটা কার্পাস বস্ত্রখানি নিম্নপ্রান্ত বাহুবন্ধনীর আকর্ষণে হাঁটুর উপরে উঠেছে। খাটো অঞ্চলখানি কোনমতে বুকের বক্ষাবরণীকে ঢেকে কাঁধ পার হয়ে পিঠে পড়েছে। মাথায় রুক্ষ কালো চুলের রাশি—রঙীন স্যাকড়ার ফালি দিয়ে তাল পাকিয়ে পরিষ্কার বাঁধা। তাতে একগুচ্ছ ফুল।

দেখে একটি টুকরো স্মিত হাসি বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাঁর মুখে। ভিখারিণী হলে কি হবে, জীবনে যৌবন-ধর্মের লীলা অমোঘ। তৈলহীন অবিন্যস্ত চুলের বোঝার উপরে পুষ্পগুচ্ছটি গুঁজেছে লল্লা। লল্লার দৃষ্টিতে মুগ্ধ সম্ভ্রম। তার প্রতি দৃষ্টিপাতের জন্য তার চোখে ওই মুগ্ধ সম্ভ্রমের শিখা জ্বলে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে সশ্রদ্ধ হাসি। সে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল। করতাল নিয়েই হাত দুটি কৃতাঞ্জলিতে আবদ্ধ করেছিল লল্লা। মণিবন্ধে অনেকগুলি শঙ্খবলয় পরেছে, হাতের আঙুলগুলি দীর্ঘ—তার অনামিকায় পিতলের অঙ্গুরীয়। পায়ে? পায়ে

ভূষণ পরে নি ? হ্যাঁ, তাও পরেছে। রূপদস্তার চরণভূষাও পরেছে।

আসবার সময়ও দেখেছিলেন। গোপুরমের মাথায় ঝোলানো বড় দীপাধারটির আলো পরিপূর্ণভাবে তার মুখে পড়েছিল। শুভ্র চক্ষুচ্ছদ রক্তাভ মনে হয়েছিল। চক্ষুপল্লবের দীর্ঘ রোমগুলি সিক্ত। লল্লা গান শুনে কেঁদেছিল।

সেদিন রাত্রে লল্লার কথা ভেবেছিলেন। চিন্তিত হয়েছিলেন। যে যৌবন-ধর্ম পুষ্পিত বৃক্ষের পুষ্পগুচ্ছের দিকে তার অন্নকাঙাল ভিক্ষাপাত্রবাহী হাতটিকে ভিক্ষাপাত্রের কথা ভুলে প্রসারিত করে—সেই যৌবন-ধর্মে মানুষ মাটির বন্ধুরতার কথা ভুলে গিয়ে আকাশের চাঁদের দিকে তাকিয়ে পথ হাঁটে। মৃত্তিকা পরমাশ্রয়—সে আশ্রয়ে পাথর কাঁটা কীট পতঙ্গ সরীসৃপ খানাখন্দরে তো অভাব নেই। আবার জ্যোৎস্নার বিষম-লাগা চোখে রঙীন সাপকে মালা ভ্রম করে গলায় পরাও তো বিচিত্র নয়।

মনে পড়েছিল উন্নিকে। শিউরে উঠেছিলেন। লল্লাও পাগল হয়ে যাবে না তো! কাঞ্জীভরম থেকে ফিরে এসেই তিনি যোশেককে বলবেন ভেবেছিলেন। কাঞ্জীভরম থেকে পরদিন প্রাতে এক প্রহরের সময় রওনা হয়েছিলেন। সকলে প্রত্যাশা করেছিলেন শিবকাঞ্চী থেকে তাঁর আহ্বান আসবে। এর পূর্বে পূর্বে তাই হয়েছে। তিনি বৈষ্ণব—বরদরাজের শতস্তম্ভ মণ্ডপে গান তিনি প্রথম করে থাকেন, তারপর আহ্বান আসে শিবকাঞ্চী থেকে। একে একে একাম্বরেশ্বর, মাতঙ্গেশ্বর, ঐরাবতেশ্বর, ত্রিপুরান্তকেশ্বর মণ্ডপে গান তিনি করেন। কোনবার এক যাত্রাতেই সেরে আসেন—কোনবার এক যাত্রায় সম্ভবপর হয় না, দুবার তিনবার যেতে হয় কাঞ্জীভরমে। এবার কোন মন্দির থেকে আহ্বান আসে নি। তিনি লোক পাঠিয়েছিলেন একাম্বরেশ্বর মন্দিরে কর্তৃপক্ষের কাছে। রঙ্গনাথন কাল প্রভু বরদরাজকে গান শুনিয়েছিলেন—আজ প্রভু একাম্বরেশ্বরের মণ্ডপে—

মধ্যপথেই রূঢ়ভাবে বাধা দিয়ে মঠাধীশ বলেছিলেন—না।

লোকটি বিস্মিত হয়েছিল। সঠিক বুঝতে পারে নি। সে কিছুটা বিভ্রান্তের মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়েই ছিল, বলতে কিছু পারে নি, চলে আসতেও পারে নি।

মঠাধীশ বলেছিলেন—একাম্বরেশ্বর সম্প্রতি দ্বাররুদ্ধ করেছেন। অর্জুনের তপস্যায় যে কিরাত বেশে এসেছিলেন—সেই কিরাত বেশের জন্য কি প্রায়শ্চিত্ত করবেন চিন্তা করছেন। প্রায়শ্চিত্ত শেষ হলে রঙ্গনাথন পালাটিকে যখন সম্পূর্ণ করবে তখন শুনবেন একাম্বরেশ্বর।

লোকটি ফিরে এসে সব বলতে রঙ্গনাথনও একটু চিন্তিত হয়েছিলেন। তিনি কি ভুল করেছেন ? কোথাও কোন অপরাধ করেছেন মহেশ্বর মহিমা কীর্তনে ? চিন্তান্বিত হয়েই ফিরেছিলেন আশ্রমে।

আশ্রমে ফিরে আগাগোড়া রচনাটি পরীক্ষা করে দেখেছিলেন—খুব যত্ন এবং তীক্ষ্ণ সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছিলেন। কোথাও কোন অপরাধ তো চোখে পড়ে নি! হঠাৎ মনে হয়েছিল—ব্যাস লিখেছেন—স্বর্ণকান্তি কিরাতরূপী মহাদেব। হ্যাঁ, এখানে তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন—হিমগিরির অরণ্যে যিনি হিমাচলে কাঞ্চনজঙ্ঘার জ্যোতিস্নাত হয়ে স্বর্ণকান্তিতে বিচরণ করেন—তিনিই নীলগিরিতে বিচরণ করেন নীলাভ কৃষ্ণকান্তিতে, নীলসমুদ্রের লাবণ্য অঙ্গে মেখে শবর বেশে। তাতে অপরাধ হয়েছে ? না—কখনও না! আর কি ? মহাভারতে অঙ্গগন্ধের কথা নেই। তিনি অঙ্গগন্ধের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, দেবতা যখন ব্যাধ শবর বেশ ধারণ করেন তখন তাঁর দেবগন্ধকে লুকিয়ে কটুগন্ধই ধারণ করেন অঙ্গে। এতে অপরাধ হয়েছে ? না। স্বীকার করতে তিনি পারেন নি।

পরদিন পত্র লিখতে বসেছিলেন তিনি।* লিখেও ছিলেন—"মহামান্য পূজ্যপাদ আচার্যদেব, দেবাদিদেব একাম্বরেশ্বর দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিরাতবেশ ধারণের জন্য প্রায়শ্চিত্তের চিন্তা করিতেছেন অবগত হইয়া কৌতূহলবশে একটি প্রশ্ন নিবেদন করিতেছি। দেবাদিদেব কি অনাদিকাল হইতে শ্মশানবাসের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত-কথাও চিন্তা করিতেছেন না?"

লিখে অনেকক্ষণ পত্রখানি ধরে বসেছিলেন। পাঠাবেন?

এই সময়েই তিনি গান শুনতে পেয়েছিলেন। সমুদ্রতটে বসে কেউ গাইছে। অতি মিষ্ট নারীকণ্ঠ। এই লল্লা! লল্লা গাইছে। উপকূল অভিমুখী সমুদ্রবায়ু বয়ে নিয়ে আসছে। তিরক্কুলের পদ। দ্রাবিড় ভারতের ঋষি তিরুবল্লুবর, প্রণাম তোমাকে। কি রচনাই দিয়ে গেছ! লল্লা গাইছে—

বেণু বীণা রবে কেন এত মিছে মোহ—
বালগোপালের হাসি-কাকলী
শুনিস নি কি তোরা কেহ?

বাঃ! এর আগে অবশ্য এমন করে মন দিয়ে কখনও লল্লার গান শোনেন নি রঙ্গনাথন। কানে ঢুকেছে—ভাল লেগেছে ওই পর্যন্ত। তখন লল্লা সম্পর্কে কোন বিশেষ কৌতূহল ছিল না। সেদিন তাঁর মনে কৌতূহলের অনেক কারণ ছিল।

ওর সম্পর্কে যোশেফের কথাগুলি রঙ্গনাথনের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছিল। খৃষ্টান হয়েছে বলে যোশেফের তণ্ডুলমুষ্টির সাহায্যও নেয় না। খৃষ্টান হবে না বলে গান গেয়ে ভিক্ষা করে খায়। ওদের পোশাকের লোভ সামলেছে। ওদের প্রবল প্রতাপের মোহেও আচ্ছন্ন হয় নি। ওদের সাদা রঙ ওর চোখে কাজল পরায় নি। মনে মনে হয়েছিল—বাঃ বাঃ বাঃ।

তারপর উন্নিকে দেখে ওর সম্পর্কে একটি আশঙ্কা জেগেছিল। যদি অসহায়া বালিকাটি এমনি করে পাগল হয়ে যায়! আহা-হা-হা!

পরশু কাঞ্জীভরমে গোপুরমের সামনে কৃতাঞ্জলিপুট লল্লার চোখের শ্রদ্ধাভারাবনত দৃষ্টি দেখে অন্তরে অন্তরে স্নেহ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল।

আজ গান গাইছে—সে গান মহর্ষি তিরুবল্লুবরের তিরক্কুলের পদ। সপ্রশংস হয়ে উঠলেন রঙ্গনাথন—অনেক শিখেছে লল্লা।

তিনি সেদিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমুদ্রতটে এসে দেখেছিলেন নারিকেলকুঞ্জে একটি বৃক্ষকাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসে সে গাইছে।

কৃষ্ণ গোপাল—কৃষ্ণ গোপাল—কৃষ্ণ গোপাল—

বরদরাজ—বরদরাজ—বালগোপাল!

অংশটুকু লল্লা নিজে জুড়েছে ওর সঙ্গে। বুদ্ধিমতী লল্লা। বাঃ! পিছন দিক থেকে এসে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে সরবে 'বাঃ' কথাটি উচ্চারণ করেছিলেন।

চমকে উঠেছিল লল্লা। চকিত ভঙ্গিতে পিছন ফিরে তাঁকে দেখেই লজ্জায় আনত হয়ে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে গিয়েছিল। রঙ্গনাথন বলেছিলেন—বাঃ! তুমি তো বড় চমৎকার গান কর! সুন্দর!

লল্লা উত্তর দিতে পারেনি। নীরবে আরও একটু যেন নত হয়ে গিয়েছিল। রঙ্গনাথন আর কথা খুঁজে পাননি। না পেয়েই বোধ হয় বলেছিলেন—থামলে কেন? গাও।

অতি মৃদু জড়িত কণ্ঠে সে বলেছিল—না প্রভু। আপনার সামনে গাইতে পারব না।

তার সে কথায় আশ্চর্য আবেগ ছিল, কথা বলতেই কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সেইটিই

তার সব থেকে বড় আকুতি।

এবার রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তিরককুলের পদ শিখলে কি করে?

—মঠে শুনেছি প্রভু। শুনে শিখেছি।

—শুনে?

—হ্যাঁ প্রভু। যেটুকু মনে থাকে লিখে রাখি।

—লিখতে পার তুমি? ও হ্যাঁ—যোশেফ বলেছিল, তুমি পাদরীদের পাঠশালায় লেখাপড়া শিখতে।

—অল্প শিখেছিলাম। তারপর মা আর পড়তে দেয়নি।

—শুনেছি।

—মা বলেছিল, লল্লা, তোর বাপ বলত কলাত্তন্নী আমার বরদরাজ স্বামীর কিরূপা পাবে।

—কলাত্তন্নী কে?

এবার মুখ তুলে স্মিত হেসে বলেছিল—আমি প্রভু। ডাকনাম আমার লল্লা। ছেলেবেলা থেকে গাইতে পারতাম, নাচতাম গান গেয়ে, বরদরাজের নাম গেয়ে। তালি দিত বাপ, তাল ভঙ্গ হত না। তাই বাবা নাম রেখেছিল—, কাঞ্জীতে গিয়ে নামটা নিয়ে এসেছিল; এক বৈষ্ণব সাধুর কাছে বাবা আমার কথা গল্প করেছিল—আমার গল্প ফুরোত না তার। সাধু বলেছিলেন, এ কন্যা তোমার কলাত্তন্নী কন্যা—বরদরাজ কিরূপা করবেন।

রঙ্গনাথন বুঝলেন, একটু হেসে বললেন—ও! কলাবন্তী!

—হ্যাঁ প্রভু, কলাবন্তী। লজ্জিত ভাবে আবার সে মাথাটি নামাল।

আপন মনে রঙ্গনাথন শব্দটি বার তিনেক উচ্চারণ করলেন—কলাবন্তী। কলাবন্তী। কলাত্তন্নী।

তারপর হঠাৎ বলে উঠলেন—কলাত্তন্নী—কল্যাণী! কল্যাণী! তুমি কল্যাণী হবে তার চেয়ে।

মাথা সে আবার তুললে—কল্যাণী!

—হ্যাঁ, কল্যাণী। কলাবন্তীও তুমি বটে, কল্যাণীও তুমি বটে। তোমার কল্যাণী রূপটিই আমার ভাল লাগে লল্লা। আমি তোমাকে কল্যাণীই বলব।

মুগ্ধ কণ্ঠে কৃতার্থর মতই সে বলেছিল—কল্যাণী!

—হ্যাঁ, কল্যাণী। নৃত্যগীতে পারঙ্গমা হয়ো তুমি। কলাবন্তী নাম তোমার সার্থক হোক। কিন্তু জীবনে তুমি কল্যাণী হবে।

দূর থেকেই সে প্রণতা হয়েছিল বেলাভূমের উপর। রঙ্গনাথন পরম স্নেহে এগিয়ে গিয়ে তার মাথার রুক্ষ কেশরাশিতে হাত রেখে বলেছিলেন—কল্যাণী হও।

সেই ভূমিষ্ঠ অবস্থাতেই সে চমকে উঠেছিল—তার সে চমক তিনি মাথায় হাত দিয়েই অনুভব করেছিলেন। সে উঠে কাতরস্বরে বলেছিল—আমাকে ছুঁলেন প্রভু!

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তুমি সেদিন আমার গান শুনেছ কাঞ্জীভরমে। শোন নি, বৈকুণ্ঠ-ধামে যাঁর বসতি তিনিই বাস করেন পৃথিবীতে, মানুষের সাদাকালো সকল চর্মের অন্তরালে? এ কি, তুমি কাঁদছ?

হাসবার চেষ্টা করে চোখ মুছে সে বলেছিল—এ শুনলে আমার কান্না পায় প্রভু। এমন কথা তো কেউ বলে না। আপনি বড় ভাল—প্রভু, আপনি বড় ভাল।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়েছিল যোশেফকে যে কথাটা বলবেন ভেবেছিলেন সেই কথাটা। এই

মেয়ে, এমন কণ্ঠস্বর, এমন সুগঠিত দেহ—নবপল্লবের মত শ্যাম দেহবর্ণ যা শবরদের মধ্যে দুর্লভ; এই দুটি দীর্ঘায়ত চোখ; এই কন্যা—আর এই মাৎস্যন্যায়ের কাল, এর—

উর্মিকে মনে পড়েছিল। তিনি বলেছিলেন—তোমার অভিভাবক কে কল্যাণী?

তিনি তার দিকে চেয়ে ছিলেন, সে আনত দৃষ্টিতে মাথা নীচু করে বসে ছিল। নীরবতার পর এই বাক্যক'টি হারিয়ে গিয়েছিল, সে ধরতে পারেনি। তিনি আবার ডেকেছিলেন—কল্যাণী!

—আমাকে বলছেন প্রভু?

—হ্যাঁ। এই মাত্র যে তোমার নাম দিলাম কল্যাণী।

হেসে সে বললে—কলাত্তমী নামও আমার সবসময় খেয়াল থাকে না। লল্লা না বললে—হাসলে আরও একটু।

—তোমার অভিভাবক কে? যোশেফ?

—অভিভাবক? না প্রভু। মানুষ কেউ আমার অভিভাবক নেই। নিতান্ত বালিকা বয়সে, আমার তখন ছ-সাত বছর বয়স—

—জানি, যোশেফ আমাকে বলেছে। বলেছে—সে তোমাকে খৃষ্টান-ধর্মে—

—ও কথা শুনতেও আমাকে বারণ করে গেছে আমার মা। আমার বাবা বলে গেছে আমি বরদরাজের কৃপা পাব। আমার কাকা আমার অভিভাবক নয়।; সে আমাদের সব নিয়ে নিয়েছে। ও ব্যবসা তো আমার বাবার ব্যবসা। বাড়ি জমি তাও নিয়েছে। আমাকে হয়তো—আমাকে বেচে দেবে ফিরিঙ্গীদের কাছে।

তার সুন্দর শান্ত চোখ দুটি উত্তেজনায় বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল। মসৃণ ললাটখানি ভরে উঠেছিল সারি সারি কুঞ্চনরেখায়। রঙ্গনাথন বলেছিলেন—তাহলে কে তোমার অভিভাবক?

—মা মরবার সময় বলে গেছে—লল্লা, বরদরাজ তোকে দেখবেন।

কথাটা এবার ঘুরিয়ে পেড়েছিলেন তিনি—তোমার বাবা কি তোমার বিয়ের কোন সম্বন্ধ করে যায় নি?

—না প্রভু।

—তোমার মা?

—তিনিও না। তিনি বলে গেছেন, এদের কাউকে বিশ্বাস নেই লল্লা। এরা সব খৃষ্টান হয়ে যাবে। তুই ওই বরদরাজের মন্দিরের চারপাশ ঝাড়ু দিবি। ভিক্ষা করবি।

—তা হলে—

—আমি তাই করব প্রভু। গান গাইতে পারি, ছেলেবেলা থেকে গান গেয়ে ভিক্ষে করি। বাইরে—দেবস্থানেই বেশী কেটেছে আমার। গ্রামে কখনও কখনও আসি। এদের মতন থাকা—সে আমি আর পারব না প্রভু।

সে অকস্মাৎ সমুদ্রের দিকে মুখ ফেরালে। তারপর বললে—আজ আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম প্রভু। কথাকলি নাচ শিখবার আর গান শিখবার যদি কোন সুবিধা করে দেন—

—তোমার কাকাও আমাকে বলেছিল—

—সে আমার শত্রু। তার নাম আপনি করবেন না। শুধু আমার নয়—আপনারও। আজ সকালে কাঞ্চী থেকে এসে গ্রামে গিছলাম। সেখানে দেখলাম কাকা আপনার নামে গজরাচ্ছে। বলছে, গান গেয়ে শবরদের আপনি অপমান করেছেন। আপনাকে দেখবে।

রঙ্গনাথন সবিস্ময়ে বললেন—আমি অপমান করেছি ?

—তারা তাই বলছে।

—তুমি ? তুমিও তো শবরকন্যা কল্যাণী। তোমার মনেও কি আঘাত লেগেছে ?

—সেদিন রাত্রে গান শুনতে শুনতে কেঁদেছিলাম। আপনি যখন বেরিয়ে এলেন তখনও চোখের পাতায় জল লেগে ছিল। ভালবাসায় মানুষ কাঁদে—সে কান্না সেইদিন কেঁদে বুঝেছি।

—তবে এরা কেন রাগ করলে বলতে পার ?

—তা তো জানি না। শুধু এরাই নয়, শিবকাঞ্চীতে তারা নাকি আপনাকে কখনো ডাকবে না।

—সেটা জানি।

তারপর অনেকক্ষণ দুজনেই স্তব্ধ হয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে—লল্লা ছিল মাটির জগতের দিকে তাকিয়ে। সমুদ্র দ্বিপ্রহরের আভাসে ঘনতর নীল এবং তরঙ্গশীর্ষ তীব্রোজ্জ্বল রৌদ্রচ্ছটায় ঝলমল করে উঠে পরক্ষণেই গাঢ় নীলের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। তিনি শুধু ভাবছিলেন—কেন ?

—কেন ? এরা এমনি—

—প্রভু !

—কিছু বলছ ?

—আপনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। এবার যাবার সময় আমি চরণ স্পর্শ করে প্রণাম করি ?

—নিশ্চয়। তুমি কল্যাণী। আর আমার প্রভুর কাছে সংসারে সব মানুষ সমান। হয়তো লল্লা, সবাই তিনি। ভক্ত শুধু আমি।

—কি সুন্দর কথা প্রভু !

প্রণাম করে উঠে সে বলেছিল—আমার নাচগান শিখবার সুযোগ কি হবে না প্রভু আমি শবরী বলে ?

—দেখব আমি। এবং হবে, নিশ্চয় হবে।

বেলাভূমির নারিকেল সুপারির ঘন বীথিকার মধ্য দিয়ে সে চলে গিয়েছিল। তিনি চিন্তিত মনে ফিরে এসেছিলেন—কেন ? কেন ? কোথায় কোন্ ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটল ?

অনেকক্ষণ পর তিনি চিত্তকে দৃঢ় করে বলে উঠেছিলেন—না, আমার অন্যায় হয় নি—হয় নি। আমি সত্যকে প্রকাশ করেছি। সত্যেরও আঘাত আছে। মিথ্যাশ্রয়ী এবং ভ্রান্তজনেরা সে আঘাতে আহত হয়। ক্রুদ্ধ হয়। হোক—তাই হোক। তিনি আবার এই গান করবেন। সারা দেশে এই গানে সুরে কথায় আচ্ছন্ন করে দেবেন।

এ সব তো এই এক মাস আগের কথা। এক মাস পর শুক্লা ত্রয়োদশী ছিল কাল, কাল ওই গান গেয়ে ফিরবার পথে এই ঘটনা।

* * * *

কালও লল্লা ছিল—বাইরে যেসব শ্রোতা দাঁড়িয়ে শুনছিল তাদের প্রথম সারিতে। কালও একটি দীপাধারের আলো তার মুখের উপর পড়েছিল। সে তাঁকে শ্রদ্ধা করে—গভীর শ্রদ্ধা; সেটা সে তাঁকে প্রতিবার নিবেদন-কালে জানাতে চায়; তাই সে এমন করে দাঁড়ায় প্রতিবার। কালও তার দীর্ঘ অক্ষিপল্লবগুলি ভিজে ছিল। তিনি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। কাল

তার সঙ্গে কথা বলবার তাঁর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কন্যাকুমারীর একদল যাত্রী এসেছিল পার্থসারথি ও কপালীশ্বর দর্শনে। তাঁদের এক প্রৌঢ়া কুমারী সন্ন্যাসিনী তাঁকে এসে অভিনন্দিত করতে গিয়ে তাঁর বিলম্ব করে দিয়েছিল—সেই সময় সে চলে গিয়েছিল। আজ সে এসেছিল তাঁকে অজ্ঞাত আততায়ীরা আঘাত করে আহত করেছে শুনে। ছুটে এসেছিল। এসে দূরে গোশালার চালায় বেদনার আর্তিতে যেন নিজে ভেঙে পড়ে কোন রকমে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখ ছলছল করছিল তিনি দেখেছেন। ঠোঁট দুটিও কাঁপছিল নিশ্চয়। শান্ত কোমল-প্রকৃতি ভক্তিমতী মেয়েটি কথা কইবার সুযোগ পেলে বোধ হয় শুধু 'প্রভু' এই কথাটি উচ্চারণ করেই রুদ্ধবাক হয়ে যেত। চোখের কোণ দুটি থেকে অশ্রুর দুটি ধারা গড়িয়ে পড়ত। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠত প্রবল কম্পনে। তাকে এরা ধরেছে শবরদের চর।

কিন্তু তারা কি শবর? শবরই যদি হয় কেন তাকে তারা আঘাত করলে? তিনি তো তাদের ভালবেসেই ওই পরম সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর সমস্ত জীবনাবেগ দিয়ে। তারা তো এর পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে গভীর ভালবাসা দিয়ে অভিষিক্ত করেছে। এদের বালক বালিকা যুবক প্রৌঢ় যে মুগ্ধ দৃষ্টিতে, প্রশংসা-প্রসন্ন হাসিতে তাঁর যে আরতি করেছে তা তো ব্রাহ্মণ শৈব ধনী বিদ্বানেরা করে নি। তারা দিয়েছে প্রসাদ, এরা করেছে পূজা। তবে? তা ছাড়া—। গন্ধের কথা এঁরা তুলেছিলেন। কথাটা খুব যুক্তিসঙ্গত। গাত্রগন্ধ একটা আছে। সেটা ছদ্মবেশে ঢাকা পড়ে না। গাত্রগন্ধ একটা পেয়েছিলেন। সেটা কি শবরদের?

না।

তবে? শৈবদের?

তাঁরাই বা এতটা ক্ষিপ্ত হবেন কেন? হতে পারে। ধর্মের আবেগ—প্রবলতম আবেগ। স্বর্গলোক থেকে পৃথিবীর বুকে যে বেগের প্রচণ্ডতা নিয়ে গঙ্গা ঝরে পড়েছিলেন, সে বেগের মুখে ঐরাবত ভেসে গিয়েছিল, তার থেকেও এ আবেগের বেগ প্রচণ্ড—প্রবলতর, প্রচণ্ডতর।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কি করবেন তিনি? তিনি তো দ্বন্দ্ব কলহ হিংসা চাননি। বরং উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। তবে এমন কেন হল!

—আচার্য রঙ্গনাথন রয়েছ?

কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন। যোশেফের কণ্ঠস্বর। যোশেফ—

—আচার্য—

নিজেকে সংযত করে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন—যোশেফ, এস এস।

যোশেফ এসে ঢুকল। চোখে তার প্রখর দৃষ্টি, পদক্ষেপ যেন যুদ্ধকামীর মত উদ্ধত এবং অপ্রয়োজনে দীর্ঘ ও সবল।

—তোমাকে কারা আঘাত করেছে শুনলাম রাত্রির অন্ধকারে?

একটু হেসে রঙ্গনাথন বললেন—হ্যাঁ। মাথায় আঘাত করে তারা দ্রুত-পদে চলে গেল। সঙ্গের সঙ্গীরা সংখ্যায় তাদের থেকে বেশী ছিল এবং কাছেই ছিল। নইলে হয়তো—

—আমি দুঃখিত আচার্য। কিন্তু তার থেকেও বড় দুঃখে ক্ষুব্ধ যে তুমি আমাদের সন্দেহ করছ।

—আমি করি নি যোশেফ, করেছেন অপর সকলে। তুমি মাদ্রাজের শ্রেষ্ঠী গোপালনের দোকানে—

—হ্যাঁ হ্যাঁ বলেছিলাম। মনে আঘাত লেগেছিল আমার।

—একটা প্রশ্ন করব তোমাকে ?

—মেরেছি কি না ? আচার্য, আমি মারলে এইটুকু আঘাত দিতাম না। উচ্চবর্ণের হিন্দু, বিশেষ করে আয়ার যারা তারা দেহের শক্তিতে দুর্বল ভীরু, কিন্তু কুটিল এবং মারাত্মক তাদের বিষ। সাপের মত। এদের মাঝখানে পা দিয়ে ছেড়ে দেওয়ায় বিপদ আছে। আমি একেবারে মেরে ফেলতাম।

—তা আমি প্রশ্ন করি নি।

—ও তবে খৃষ্টান হয়েছি বলে জিজ্ঞাসা করছ ? শোন আচার্য, খৃষ্টান হয়েও শবর ছিলাম এটা ভুলতে পারি না।

—তাও নয় ভাই। আমার প্রশ্ন আমি তো তোমাদের ভালবাসি এবং সেই কথাই তো বলেছি। তবে কেন দুঃখ পেলে তোমরা ?

—কেন ?

এ প্রশ্নে স্তব্ধ হয়ে যোশেফ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ হয় ভেবে নিলে। তার পর বললে—কথাটা তোমার সত্য। এতটা ভাবি নি। তবে এটা সত্য রঙ্গনাথন, গান শুনে রাগ হয় আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে এও বলি, আঘাত আমরা করি নি। এটা বিশ্বাস করো।

—বিশ্বাস করলাম যোশেফ।

—আমার ভাইঝি লল্লা এসেছিল ? তাকে এখানে শ্রীনিবাস চৌকিদার দিয়ে পাকড়াতে চেয়েছিল আমাদের গুপ্তচর বলে ?

—হ্যাঁ। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম যোশেফ। কিন্তু তারা শোনে নি।

—তাও শুনেছি। কিন্তু সে তোমার ভক্ত। ভক্তি করে। তোমার গান সে আমাদের সকলের চেয়ে ভালবাসে। তাই সে এসেছিল বোধ হয়। গুপ্তচর আমাদের নয়। আমাদের কেউই সে নয় আর। তার মা তাকে আমাদের পর করে দিয়ে গেছে। তাকে ভিক্ষুক করে দিয়ে গেছে। মন্দির ঝাঁট দিয়ে খেতে বলেছে। সে ভিক্ষুক। শবরদের চেয়েও অধম। গুপ্তচর হলে শৈবদের—আমাদের নয়।

একটু তিক্ত হেসে বললে—চর সে কারুরই নয় রঙ্গনাথন—সে তোমার উচ্ছিষ্ট-সন্ধানী লোভী কুক্কুরী।

—যোশেফ!

রঙ্গনাথনের কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে উঠল এবার।

হেসে যোশেফ বললে—সেদিন বালুবেলায় তোমাদের আলাপ আমাদের কেউ কেউ দেখেছে, শুনেছে। তার কাছে তুমি বড় ভাল—বড় ভাল রঙ্গনাথন। তুমি তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছ, সে তোমার পায়ে হাত দিয়েছে, এর কিছু অজানা নেই আমাদের। সে যদি আমাদের হত, তা হলে তোমার কাছে এর জন্য কৈফিয়ত চাইতাম। কিন্তু সে ভিক্ষুক। আমাদের সে কেউ নয়। আচার্য রঙ্গনাথন, তোমাকে আঘাতকারী যদি কেউ লল্লার প্রতি লুব্ধ ব্যক্তি হয়, তবে তাও আশ্চর্য হব না আমি। তোমার গান শুনতে শুনতে সে যেন মোহগ্রস্ত হয়, এলিয়ে পড়ে। এ হয়তো তুমি জান না, কিন্তু আমরা জানি। শবরদের যারা পালা গান শুনতে যায় তারা বলেছে আমাকে। সেদিনই বলেছে, ওই কথাপ্রসঙ্গে।

রঙ্গনাথন কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। যোসেফ বললে—তুমি আঘাত পেয়েছ, তার জন্যে আমি দুঃখিত। আমি আঘাত করলে তোমাকে হত্যা করতাম। কন্যাটি আমাদের কেউ নয়। আচ্ছা, চললাম।

চলে গেল সে। রঙ্গনাথন দাঁড়িয়ে রইলেন স্তম্ভিতের মত।

সামনের সমস্ত কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। দুর্বোধ্য একটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলা—সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। চিত্তলোক অন্ধকার। কানে কিছু শুনছেন না।

বুকে একটা কিসের আঘাত চলেছে। অনুভবে বুঝছেন।

হে বরদরাজ স্বামী! ক্ষমা কর। ক্ষমা কর প্রভু।

অকস্মাৎ একটি যন্ত্রণা-কাতর মৃদু আর্তনাদ তাঁর কানে এসে ঢুকে তাঁকে সচেতন এবং ঈষৎ চকিত করে তুললে।

উঃ! উঃ! উঃ মা!

কি? কে? কোথায়?

উঃ-হু-হু!

এ তো সেই লল্লা! কিন্তু—।

দিক লক্ষ্য করে রঙ্গনাথন গোশালার দিকে তাকালেন। গোশালার চালার পাশেই বিচালির স্তূপ। পোয়াল অর্থাৎ, এলো খড় স্তূপের মত করে রাখা হয়েছে। সেটার মাথা নড়ছে। শব্দ ওখান থেকেই আসছে। তিনি দ্রুতপদে এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, পড়ে গেল পোয়ালের মাথাটা। পোয়ালের পিছন দিকেই ঘন বৃক্ষবেষ্টনী। সেই দিক থেকে পোয়াল ঠেলে উঠে দাঁড়াল লল্লা। মাথার রুক্ষ চুলে মুখে খড়ের কুটি লেগেছে কিন্তু সেদিকে তার লক্ষ্য ছিল না—একটা যন্ত্রণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছে। দাঁড়িয়ে সে যেন এই যন্ত্রণার মধ্যেও সঙ্কোচে প্রাণপণে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে।

—কি হল? লল্লা! লল্লা!

—ওঃ, কিসে আমাকে কামড়েছে প্রভু!

—কোথায় কামড়েছে? কোন্ জায়গায়?

—পিছন দিকে। ঠিক ঘাড়ের নীচে। চুলের মধ্যে ঢাকা পড়েছে।

—দেখি দেখি।

লজ্জায় সে যেন মাটির সঙ্গে মিশে গেল, বললে—না প্রভু, আমি যাই, সমুদ্রের জলে গিয়ে ডুব দিই। তাতে সেটা ছেড়ে দেবে।

—না, দেখি। তোমার লজ্জার এতে কারণ নেই।

—আমি শবরী।

—না, তুমি মানুষ। অবাধ্য হতে নেই। বস পিছন ফিরে।

বলতে বলতেই তিনি নিজেই তার পিছনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেও অবাধ্য হল না, বসল। রঙ্গনাথন সন্তর্পণে তার অযত্ন-বদ্ধ, রুক্ষ, পোয়ালের ধূলায় ধূসর চুলের বোঝায় হাত দিলেন। লল্লা বললে—দেখবেন প্রভু, আপনাকেও হয়তো কামড়াবে।

রঙ্গনাথন সন্তর্পণে চুলের বোঝা ওল্টাতে ওল্টাতে বললেন—ওখানে ঢুকলে কেন?

—ভয়ে প্রভু। ঘরে যখন শবরদের কথা বলছিলেন শ্রেষ্ঠী গোপালন, তখন বাইরে কয়েকজন কে আমার দিকে আঙুল দেখাচ্ছিল। আমি ভয়ে ওই পোয়ালের পিছনদিকে গিয়ে লুকিয়েছিলাম। তারপর আমার নাম করতে ভয়ে ওই পোয়ালের ভিতর—

রঙ্গনাথন বললেন—এ কি! এ যে—! এঃ, রক্ত বের করেছে কামড়ে!

বিষাক্ত বৃশ্চিক জাতীয় কীট। কর্কটের মত দুটো দাড়ায় তার পিঠের মাংস কেটে কামড়ে ধরেছে এবং হুল দিয়ে দংশন করেছে। দাড়ায় কাটা, ক্ষত থেকে রক্তের একটি ধারা গড়িয়ে

এসেছে। তখনও ছাড়ে নি। নিষ্ঠুর আক্রোশ হয়েছে কীটটার। রঙ্গনাথন মুহূর্ত চিন্তা করে তাঁর পুরু উত্তরীয়ের ভাঁজে কীটটাকে সন্তর্পণে দৃঢ় দুটি আঙুলে চেপে ধরে সজোরে টেনে নিলেন। লল্লা যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। উঃ—

কিন্তু অর্ধপথেই নিজেকে সংযত করে স্তব্ধ হল। হাতে টিপেই সেটাকে মেরে ফেলে দিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—লল্লা, এ বিষাক্ত ছোট বৃশ্চিক। তুমি কি যন্ত্রণার সঙ্গে অবসন্নতা বোধ করছ?

—হ্যাঁ প্রভু।

—তোমাকে বিশ্রাম করতে হবে। আমার কাছে ওষুধ আছে লাগিয়ে দেব। ওঠ। উঠতে পারবে?

—আমায় কোন গাছতলায় শুইয়ে দিন প্রভু।

—না। ঘরে বিশ্রাম করবে।

—না।

আর্তস্বরে সে বলে উঠল।

—না নয়। ওঠ।

—তা হলে ওই গোশালায়—

—না। না। ওঠ। একি তুমি যে কাঁপছ!

—বড় যন্ত্রণা হচ্ছে। আর—

মুখ ঠোঁট যেন শুকিয়ে গেছে, চোখ দুটির পাতা ঢলে আসছে। দাঁড়িয়ে ভেঙে পড়ছে। রঙ্গনাথন তাকে দুই হাত প্রসারিত করে, হাতের উপর শুইয়ে ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। বিড় বিড় করে প্রতিবাদই করলে লল্লা, কিন্তু কণ্ঠস্বর জিহ্বা যেন জড়িয়ে যাচ্ছে। রঙ্গনাথন তার মুখে খানিকটা জল দিলেন খাবার জন্য। মুখ ধুইয়ে দিলেন। মাথাটা ধোয়ানোর প্রয়োজন। পিছনের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে প্রচুর জল ঢাললেন মাথায়। আরও খানিকটা জল খাওয়ালেন। এতে একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলতে চেষ্টা করলে লল্লা। রঙ্গনাথন বললেন—চুপ করে শুয়ে থাক। আমি বাইরে থেকে একটা শিকড় তুলে আনি। খাওয়ালেই এবং ওই-খানে ঘষে লাগালেই অনেকটা সেরে যাবে। কিন্তু কথা শুনো, উঠো না তুমি।

বাইরে এসে নিজের বাগান খুঁজে শিকড় ওষুধ তুলে এনে গোলমরিচ মিশিয়ে বেটে খানিকটা খাইয়ে দিলেন,—কয়েক মুহূর্ত পরেই লল্লা যন্ত্রণা উপশমের আরামে বলে উঠল, আঃ। সঙ্গে সঙ্গে হাতখানি বাড়িয়ে কিছু যেন খুঁজলে।

রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করলেন—কি, কি খুঁজছ?

—আপনার চরণের ধুলো একটু—

—না।

—প্রভু, দিন। তাতে আমার মনে বল হবে।

এবার দ্বিধা করলেন না রঙ্গনাথন। তিনি বিশ্বাসের বলকে জানেন। নিজে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—এবার ঘুমোও দেখি একটু।

—আমাকে এইবারে বাইরে—

—চুপ কর।

উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে তিনি জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ালেন। বৃক্ষবেষ্টনীর একটি ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শহর থেকে গ্রামে আসবার যে পথটা

তাঁর আশ্রমের সুমুখ দিয়ে চলে গেছে, সেই পথে দূরে, জন দুই সওয়ার এবং কয়েকজন লোক আসছে। সওয়ারদের পোশাক যেন কোতোয়ালীর পোশাক। মান্দ্রাজের ফিরিঙ্গিদের কোতোয়ালী কোথায় যাবে? এখানে নয় তো? যদি হয়! হওয়া খুবই সম্ভব! হঠাৎ তাঁর মাথাটা ঘুরল যেন আপনা-আপনি।

লল্লা অবসন্ন লতার মত পড়ে আছে! বোধ হয় ঘুম আসছে। বিষ এবং ওষুধ দুয়ের ক্রিয়াতেই এখন ও আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকবে কয়েক প্রহর। তারা লল্লাকে খুঁজেছিল। শ্রীনিবাসন প্রতিজ্ঞা করে গেছে, এর প্রতিকার সে করবেই। লল্লাকে যদি ধরে! মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ফেললেন রঙ্গনাথন। পাশের ছোট ঘরটির দরজা খুলে ফেললেন। ঘরটিতে আবার দুখানি ঘর। একখানি ভাণ্ডার, তার ওপাশের খানি পূজার। পূজার ঘরে সুন্দর একখানি সিংহাসনে বরদরাজ স্বামীর অনুকৃতি, তাঁর পাশে লক্ষ্মী, আর একটি আসনে পিত্তলের নটরাজ-মূর্তি। নানান ধরনের সুশোভন সামুদ্রিক শঙ্খ, কড়ি ঝিনুক দিয়ে সাজানো। ফুল বিছানো। এই ঘরে, দেবতার সামনে মেঝের উপর, লল্লার অসাড় নমনীয় দেহখানি বয়ে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলেন। মনে মনে বললেন, ওর অপরাধ কিছু নেই প্রভু। যদি অপরাধ হয় তবে আমার। দণ্ড আমাকে দিয়ো। তুমি ওকে রক্ষা কর।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে তালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর ভাণ্ডার ঘর থেকে এ ঘরে এসে, দরজা বন্ধ করে আপন আসনে বসলেন।

মাথার ক্ষতে এতক্ষণে যেন যন্ত্রণা বোধ করছেন। ক্লান্তিও বোধ হচ্ছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মনে মনে বললেন, হে বরদরাজ! হে বৈকুণ্ঠেশ্বর!

অশ্বপদশব্দ যেন আশ্রমের বাইরেই থামল। রঙ্গনাথন বুঝলেন, তাঁর অনুমান মিথ্যা হয় নি। যারা আসছিল তারা এখানেই এসেছে। কণ্ঠস্বরও শুনলেন পরমুহূর্তে—আচার্য রঙ্গনাথন!

—আসুন।

ভিতরে এলেন কোতোয়ালীর কর্মচারী। অভিবাদন করে দাঁড়ালেন। রঙ্গনাথন উঠে বাইরে এলেন—বলুন।

—মাননীয় শ্রীনিবাসন আমাদের পাঠালেন। বললেন, আচার্যের আশ্রম পাহারা দিতে হবে। সারা শহরে নানান গুজব রটেছে। বলছে, আচার্যের আশ্রম যে কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে।

—সে কি! কে আক্রমণ করবে? এবং কেনই বা করবে?

—যারা আক্রমণ করেছিল, এবং যে কারণে করেছিল তারাই করবে, সেই কারণেই করবে।

রঙ্গনাথন বিব্রত হয়ে উঠলেন এবং তিক্তও হলেন—না না না। এ ধারণা ভ্রান্ত। এ হতে পারে না। আপনারা যান।

—আমরা আদেশের দাস। স্থানত্যাগের তো আদেশ নেই।

—বেশ, আমি স্থানত্যাগ করছি।

—তাহলে, প্রভু, আমরা একজন আপনার সহগামী হব, একজন এখানে আপনার গৃহ রক্ষার জন্য থাকব।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। সারা চিত্ত বিদ্রোহী হয়ে বলে উঠল, এ কী অত্যাচার!

কর্মচারীটি বললেন—শুধু তাই নয় আচার্য, মাননীয় শ্রীনিবাসন বলে দিয়েছেন যে আপনি যেন এখন তাঁকে না জানিয়ে কোথাও গান করতে যাবেন না।

—কাঞ্জীভরম এবং মহাবলীপুরম তাঞ্জোর এসব স্থান এখনও কোম্পানীর অধিকারের বাইরে। সেখানে নিশ্চয় এ আদেশ বলবৎ নয়।

—তা নয়। কিন্তু মান্দ্রাজের এলাকা পর্যন্ত আমরা সঙ্গে থাকব। তারপর অন্য সীমানায় পা দিলেই আমরা ফিরে চলে আসব। আচার্য, জানেন না আমরা শুনে আসছি শহরে উত্তেজনা প্রবল। পাদরীরা উত্তেজিত হয়েছে তাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছে বলে, হিন্দুদেরও শৈব যারা তারা উত্তেজিত হয়েছে, তাদের সন্দেহ করা হয়েছে বলে। আপনার গুণমুগ্ধেরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ আপনার উপর আক্রমণের জন্য। ওদিকে প্রভু শ্রীনিবাসন কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তিনি আদেশ দিয়েছেন আক্রমণকারীদের সন্ধান করা চাই। সারা শহরে লোক বেরিয়েছে, খুঁজছে কোথায় গেল সেই শবর ভিখারিণী।

অসহায় অথচ তিক্ত কণ্ঠে রঙ্গনাথন বললেন—তার জন্য আমাকেই গৃহবন্দীর মত আপনাদের প্রহরাধীনে বাস করতে হবে?

—না না না। আমরা আপনার আজ্ঞাধীন, আপনাকে রক্ষা করবার জন্যই এসেছি। আপনার মঙ্গলের জন্য।

—আমি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছি। আমি মনে করি আমার শত্রু কেউ নেই। আমি কারুর শত্রু নই। রক্ষা আমাকে করেন এবং করতে পারেন একমাত্র আমার দেবতা আমার প্রভু শ্রীবরদরাজ।

কিসের যেন শব্দ উঠছে না? রঙ্গনাথন কথা বলতে বলতেও উৎকর্ণ হয়ে আছেন। প্রায় চেতনাহীন হয়ে পড়ে আছে লল্লা। তার তো নিজের উপর কোন সংযম নেই, সে তো জানে না এদের উপস্থিতির কথা।

কোতোয়ালীর কর্মচারী বললে—আচার্য জানেন না এমন কথা অনেক আছে।

দৃঢ় কণ্ঠ উষ্ণ হয়েই বললেন রঙ্গনাথন—সব কথা কেউ জানে না ভাই। ভাল, এখন আমার অনুরোধ—আপনারা কোন বৃক্ষতলে ছায়াতে বিশ্রাম করুন। আমার পূজার সময় হয়েছে। আমি পূজা করব। এ সময়—

—নিশ্চয়। নিশ্চয়। তাই আমরা যাচ্ছি।

তারা বারান্দা থেকে নেমে ছায়াঘন একটি লতামণ্ডপের তলদেশে গিয়ে বসল।

রঙ্গনাথন ছোট ঘরটির প্রথম দরজা খুলে ভাণ্ডার ঘরে প্রবেশ করলেন। তারপর ঢুকলেন পূজার ঘরে। অসম্বৃতবাসা লল্লা লুটিয়ে পড়ে আছে লতার মত। মুখে এখনও যন্ত্রণার ছাপ রয়েছে। তার একখানি হাত গিয়ে পড়েছে পূজোপকরণগুলির উপর। ছোট একটি ধূপাধারে ধূপশলাকা পুড়ছিল—সেটি পড়ে গেছে। হাতখানির চাপে ধূপশলাকা নিভে গেছে। শব্দটি সম্ভবত এই জন্য হয়েছে। মৃদু কাতর শব্দ একটি মধ্যে মধ্যে বেরিয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে। রঙ্গনাথন নাড়ী দেখলেন। নাড়ী দুর্বল—কিন্তু আশঙ্কা করার মত কিছু নয়। একটু দুধ দিলে বোধ হয় উপকার হত। ভোগের দুধ আছে। পূজাতে তাঁর আড়ম্বর নেই। অল্প কিছু ফুল-চন্দন-ধূপ-দীপ আর ভোগ—দুধ ও শর্করা এবং নারিকেল ও কদলী; ভোরের পূজা হয়ে গেছে। দ্বিপ্রহরের পূজার সামগ্রী সাজিয়ে তারপর তিনি সহানুভূতি-জ্ঞাপনকারীদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এখন দ্বিপ্রহরের পূজা কেমন করে করবেন? ভোগ না দিয়েই বা দুধ কেমন করে খাওয়াবেন লল্লাকে? লল্লা হাঁ করছে—জল চাইছে। চোখ মেলেও চাইলে একবার। চোখ রক্তবর্ণ হয়ে

উঠেছে। চোখের তারা দুটি যেন স্বচ্ছ। তিনি মৃদু স্বরে ডাকলেন—লল্লা!

লল্লা সাড়া দিলে না। আবার হাঁ করলে।

রঙ্গনাথন দেবতার চরণোদক নিলেন কুশীতে, তারপর ঢেলে দিলেন তার মুখে। আবার সে হাঁ করলে, আবার—আবার। একবার আরক্ত চোখ মেলে বিভ্রান্তের মত লল্লা বললে—আঃ! তারপর তাঁর দিকে তাকিয়ে বললে—বড় জ্বালা সর্বাঙ্গে।

বলেই আবার সে চোখ বন্ধ করলে। রঙ্গনাথন ভাবলেন একটু, তার পর সংকল্প স্থির করে দেবতার সামনে থেকে একটু সরিয়ে পুজোপকরণগুলি আবার ঠিক করে নিয়ে বসে করজোড়ে বললেন—হে বরদরাজ! করুণাময়! যদি অপরাধ হয়, সে দণ্ড আমাকে দিয়ো। তোমার ভক্তিতে বিগলিত এই বালিকার প্রাণরক্ষার জন্য তোমার পূজা করব সংক্ষেপে এবং তোমার প্রসাদ দিয়েই ওর সেবা করব।

আবার লল্লা অস্ফুট স্বরে বললে—বড় দাহ, বড় জ্বালা!

রঙ্গনাথন ভেবে নিলেন এক মুহূর্ত। তারপর আসন ছেড়ে উঠে ভাণ্ডার ঘরের কোণে রক্ষিত বড় মাটির কলসী থেকে বড় ভৃঙ্গার পরিপূর্ণ করে নিয়ে এসে বসলেন। আচমন করে, সংক্ষেপে প্রাথমিক কৃত্যগুলি সেরে, ভৃঙ্গারের জল নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ করে দেবতার মাথায় কুশীতে করে জল ঢেলে গোটা ভৃঙ্গারটি নিয়ে উঠে এসে লল্লার শিয়রে বসে আবার উচ্চ কণ্ঠেই উচ্চারিত মন্ত্রের সঙ্গে তার সর্বাঙ্গ জলধারায় অভিষিক্ত করে দিলেন।

আত্রেয়ী ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযূর্গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা চ কৌশিকী॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সর্বা সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তাঃ॥
সিন্ধু-ভৈরব-শোনাদ্যা যে হ্রদা ভুবি সংস্থিতা।
সর্বে সুমনসো ভূত্বা ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥
লবণেক্ষু—সুরাসর্পির্দধিদুগ্ধ-জলাত্মকাঃ।
সপ্তৈতে সাগরাঃ সর্বে ভৃঙ্গারৈঃ স্নাপয়ন্তু তে॥

অভিসিঞ্চনের স্নিগ্ধতায় লল্লার দেহের জ্বালা যেন জুড়িয়ে গেল। সে আবার চোখ মেলে চাইলে। মৃদুস্বরে বললে—আরও। আঃ!

আবার এক ভৃঙ্গার জল এনে দেবতার চরণ স্পর্শ করিয়ে নিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে তাকে স্নান করিয়ে দিলেন। লল্লার ধূলি-ধূসরতা ধুয়ে গেল—শুষ্কতাও মুছে গেল খানিকটা। সে আবার মৃদুস্বরে বললে—আঃ!

এবার পূজা সারলেন রঙ্গনাথন। লল্লার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগস্পর্শ না থাকলেও তার অস্তিত্বের স্পর্শ রঙ্গনাথন অনুভব করেও নিজেকে অশুচি মনে করলেন না। পূজা সেরে ভোগ নিবেদন করে দুধটুকু নিয়ে তিনি লল্লার মাথার গোড়ায় বসে মৃদুস্বরে ডাকলেন—লল্লা!

লল্লা চোখ মেলে চেয়ে বললে—অ্যাঁ! তারপর সকৃতজ্ঞ হেসে বললে—প্রভু!

—দুধটুকু খাও তো। হাঁ কর আমি ঢেলে দিই। হাঁ কর।

লল্লা কিন্তু হাতে ভর দিয়ে উঠতে চেষ্টা করলে। একটু উঠেই সে সভয়ে অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। তিনি এক হাতে লল্লার মুখ চেপে ধরে বললেন—চুপ কর লল্লা। বাইরে কোতোয়ালীর লোক—

থরথর করে কাঁপছে লল্লা। ফিসফিস করে বললে—আমি শবর-কন্যা, পূজার ঘরে—

—চুপ কর। না হলে উপায় ছিল না। দেবতা তাতে রুষ্ট হন নি। তিনিই তোমাকে রক্ষা করবেন। আমি বলছি। খাও। তুমি খাও। ওদের অনেক অর্ধসত্যে ছলনা করে বৃক্ষতলে বসিয়ে রেখে এসেছি। তুমি সুস্থ হয়ে ঘুমোও। আর ভয় নেই। এবার সুস্থ হয়ে উঠবে। শুধু শব্দ করো না।

বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে রঙ্গনাথন বেরিয়ে গেলেন। লল্লা হাত জোড় করে বরদরাজের ক্ষুদ্র অনুকৃতিটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। কিন্তু একটু পরেই আবার ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল।

রঙ্গনাথন বাইরে এসে দেখলেন প্রহরী দুটি বৃক্ষচ্ছায়াতলে সমুদ্রের আর্দ্রবায়ুস্পর্শে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তিনি ওপাশের বারান্দায় রান্নাঘরে রান্নার আয়োজনে বসলেন। এ বাড়িতে তিনি একাই বাস করেন। এ পর্যন্ত কোনদিন শত্রুর ভয় তিনি করেন নি। রমণীহীন সম্পদহীন গৃহ, থাকবার মধ্যে দুটি দুগ্ধবতী গাভী। তা নিয়েও চোরের ভয় ছিল না। নিজেও সুস্থ-সবল-দেহ যুবা। বাল্যাবধি কর্মের পরিশ্রমে অভ্যস্ত। বৈষ্ণব গুরুর আশ্রমে এবং সঙ্গীত শিক্ষক আচার্যের গৃহে শ্রমসাধ্য কর্মে তাঁদের সাহায্য করতেন। কুড়ুল দিয়ে কাঠ-চেলানো এবং নিজ হাতে কুপিয়ে বাগান করা ছিল তাঁর প্রিয় কর্ম। জলও তুলতেন কূপ থেকে। এখানে নিজের আশ্রমে এখনও কাজগুলি অবসরমত করে থাকেন। পরিচারক বৃদ্ধ কুড়ুমণির কর্মের লাঘব করে দেন। বৃদ্ধ পরিচারক কুড়ুমণির পাশের গ্রামেই বাড়ি। সে রাত্রে বাড়ি যায়, সকালে আসে। গরু দুটির পরিচর্যা করে। শহর থেকে প্রয়োজনমত জিনিসপত্র আনে। তিনি গানের নিমন্ত্রণে বাইরে গেলে সে অবশ্য এখানেই শোয়। আজ ভোরবেলাতেই তিনি তাকে পাঠিয়েছেন তিরু আল্লিকেনি—পার্থসারথি মন্দিরে। সেখানে আজ পূর্ণিমায় তাঁর গানের কথা ছিল। দুর্ঘটনার কথা জানিয়ে মার্জনা চেয়েছেন রঙ্গনাথন। সংবাদ হয়তো তাঁরা পেয়েছেন, কিন্তু তবু তাঁর দিক থেকে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর সঙ্গের যন্ত্রীরা কজন কাল রাত্রে এখানে থেকে সকালে আপন আপন বাড়ি চলে গেছে। নিরীহ যন্ত্রশিল্পী—তারা ভয়ও পেয়েছে। তাদের বাড়ি সব এই দিকেই কাছাকাছি পল্লীতে। বৃদ্ধকে না পাঠিয়ে উপায় ছিল না।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রঙ্গনাথন। ভাগ্যে বৃদ্ধ এখানে ছিল না। থাকলে তার চোখ এড়িয়ে বেচারা লল্লা ওই পোয়ালের মধ্যে আত্মগোপন করতে পারত না। কোতোয়ালীতে তার লাঞ্ছনার সীমা থাকত না। আজ তার চেয়ে এই বৃশ্চিক-বিষ-জ্বালাও তার পক্ষে অনেক ভাল।

বরদরাজ তাকে রক্ষা করেছেন। তাঁর পায়েই তাকে উনি রেখে এসেছেন।

আবার তিনি বললেন—এবার স্ফুট কণ্ঠেই বললেন—হে বরদরাজ। তুমি পতিতের ভগবান। আজ তোমার চরণে তার আশ্রয় নেওয়ায় যদি অপরাধ হয়ে থাকে তবে সে অপরাধ আমার—তার নয়। দণ্ড দিতে হলে আমাকে দিয়ো। তুমি অন্তর্যামী, তুমি জান—তোমার জন্য তার কত আকুতি। তুমি তাকে রক্ষা কর।

* * *

বরদরাজস্বামী—পতিতের ভগবান! বিপন্নের রক্ষক! অনন্ত করুণার আধার! রঙ্গনাথনের উপলব্ধি মিথ্যা নয়। তিনি সঠিক সত্যকেই উপলব্ধি করে গান রচনা করেছিলেন—"যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে তিনিই বাস করেন শবর-পল্লীতে, সকল পতিত পল্লীতে—ওই ওদের

মধ্যে—ওদের কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে। কৈলাসে যিনি বাস করেন ভবানীপতি—তিনিও আছেন ওদের মধ্যে। ওদের কৃষ্ণচর্ম দেখে যদি তোমার ঘৃণা হয়, ওদের পল্লীর অপরিচ্ছন্নতার কটু গন্ধে যদি তোমার দ্বিধা হয় কাছে যেতে, তবে তোমার জানা হবে না তাঁকে। ব্রাহ্মণ-তনয় তুমি, ব্রহ্মাভিলাষী,—ক্রোধে,—ঘৃণায়, অহংকারে শিক্ষার মধ্যে তোমার জানা হয় নি ব্রহ্মকে। আমি নারী—আমার ধর্মে আমি অধিষ্ঠিতা। আমার যিনি পতি তিনি শুধু আমার পূজ্যই নন, তিনি আমার প্রিয়—প্রিয়তম। তাঁর সেবা আমার ধর্মই শুধু নয়—সে-ই আমার জীবনধর্ম, সেই আনন্দ—যার স্বাদে আর ব্রহ্মের স্বাদে প্রভেদ নেই। তুমি তাতে আমার উপর ক্রুদ্ধ হলে। সে ক্রোধে ক্ষতি হয় নি, হবে না আমার। সুতরাং তোমার পরমসত্য পরমতত্ত্বকে জানা সম্পূর্ণ হবে ব্যাধ-পল্লীতে, ব্যাধধর্মে অধিষ্ঠিত ধর্মব্যাধের কাছে। ঘৃণা করো না, নাসিকা কুঞ্চন করে প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে যেয়ো না। প্রবেশ করো। তুমি কি জানো, ভবানীপতি মহারুদ্র কিরাতরূপেই দেখা দিয়েছিলেন তপস্যা-পরায়ণ অর্জুনকে। অর্জুন কিরাত বলে অবজ্ঞা করেছিল, ঘৃণাও করেছিল। কিরাতরূপী ভগবান তার সে শক্তির অবজ্ঞা চূর্ণ করে-ছিলেন তার বুকে একটি মুষ্ট্যাঘাত করে। ঘৃণাকে উপহাস করেছিলেন—অর্জুনের ইষ্টকে নিবেদন করা মাল্যখানি তাঁর কণ্ঠে ধারণ করে। হিমগিরির কাঞ্চনজঙ্ঘার স্বর্ণচ্ছটায় প্রতিভাত স্বর্ণকান্তি কিরাত নীলগিরিতে যখন আসেন তখন তিনি সুনীল সমুদ্রলাবণ্যে অবগাহন করে হন নিবিড় নীলকান্তি।"

অপার বরদরাজের করুণা। এবং হয়তো আশ্চর্য সত্য তাঁর উপলব্ধি। লল্লা যেন রহস্যের মহিমা দেখিয়েই গভীর রাত্রে ঘুমন্ত প্রহরীদের ব্যঙ্গ করে অন্তর্হিতা হয়ে গেল।

অপরাহ্ণে সুস্থ হয়ে উঠেছিল লল্লা এবং কেঁদেছিল। তাঁকে বলেছিল—আর নয়, এবার আমার জ্ঞান হয়েছে, আমি সুস্থ হয়েছি। প্রভু, এ পূজা-মন্দিরে আতুর বলে চেতনাহীনা আমার যে অধিকার ছিল সে আর নেই। আমার অপরাধের জন্য আমি ভাবি না প্রভু, রাজপ্রতিনিধির শাস্তি-লাঞ্ছনাকেও আমার ভয় নেই। আপনি আমাকে বের করে প্রহরীদের হাতে সমর্পণ করুন। প্রভু—

রঙ্গনাথন বলেছিলেন, না।

—আমার জন্য বরদরাজ আপনার উপর রুষ্ট হবেন। আপনার তপস্যা—

বাধা দিয়ে রঙ্গনাথন বলেছিলেন, আমার তপস্যা এতেই পূর্ণ হবে কল্যাণী। তুমি লল্লা নও, নও কলাবন্তী, তুমি কল্যাণী। তুমি থাক। দেবতার মহিমার মত তুমি এই ঘরে থাক। মিথ্যা বলব না কল্যাণী, আমি যে বরদরাজের করুণাধন্য মহিমাকে আজ প্রত্যক্ষ করছি আমার পূজার ঘরে। কিন্তু আর কথা বলো না। ওরা এখনও সন্দেহের অবকাশ পায় নি। এরপর কখন কোন মুহূর্তে সন্দেহ করে বসবে। এই প্রভুর প্রসাদ রইল—দুধ, শর্করা, কদলী। খেয়ো। দুর্বল হয়েছ—বল প্রয়োজন।

—কিন্তু কতদিন রাখবেন প্রভু?

—ওই ওঁকে প্রশ্ন কর।

—যদি আমার অস্তিত্ব ওরা জানতে পারে তবে আপনাকে যে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। প্রভু, না—

—চুপ। তারপর স্মিত হেসে বলেছিলেন—সেই লাঞ্ছনায় আমার তপস্যা পূর্ণ হবে লল্লা।

লল্লা শব্দটির মধ্যে সঙ্গীত আছে। শব্দটি আপনি বেরিয়ে এসেছিল কল্যাণীর পরিবর্তে।

তিনি বাইরে এসে বীণা বাজিয়ে গান করেছিলেন। প্রথমেই সঙ্গীত অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বন্দনা করে গেয়েছিলেন গোটা দক্ষিণ ভারতে বহু প্রচলিত স্তবগান—

কলাদেবতে শরণম
বন্দে মধুর চরণম—
বন্দে মধুর সঙ্গীত দেবতে কলাদেবতে শরণম—
সত্য সুর স্বরূপিণী
সমস্তকে দুখহারিণী
আনন্দ মৃদবাহিনী
আনন্দ ভৈরব মোহিনী
তালমেল সম্মিলিত নাশিত
রাগরঙ্গিণী হৃদয়হাসিনী
মেঘ মধুরিম মঙ্গল বদনম্
মোহ দরদী
জীবজীবনী জীবজীবনী
কলাদেবতে—
কলাদেবতে শরণম।

প্রহরী দুটি বিভোর হয়ে শুনেছিল। কুড়ুমণি বাড়ি যেতে যেতেও যেতে পারে নি। কুড়ুমণি পার্থসারথি মন্দির থেকে ফিরে এসেছে একটু আগে। বৃদ্ধ মানুষ, তার উপর একটু পেটুক সে। সেখানে প্রসাদ পেয়ে দুপুরে বিশ্রাম করেছে। তার উপর নদী পার—সমুদ্রের কাছাকাছি নদীগুলি মোহনার কাছে বিস্তারে বিপুল; খরায় নৌকা এপার থেকে ওপারে গেলে ফিরতে প্রায় একবেলা কেটে যায়। আদিয়ায় নদী পার হতে দেরি হয়েছে। ফিরবার পরই সে বাড়ি যাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিল। তাকে এবং প্রহরী দুটিকে তাদের রাত্রের খাবার দিয়ে তিনি বীণা নিয়ে বসেছিলেন। তন্ময় হয়ে গিয়েছিলেন গানে। তাঁর নিজের চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল, প্রহরী দুটি বার বার চক্ষু মার্জনা করেছিল, কুড়ুমণি ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। তিনি বেশ অনুভব করেছিলেন পূজার ঘরেও লল্লা কেঁদেছিল শুয়ে শুয়ে। রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে গেলে বীণাটি তিনি রেখে তাঁর শয্যার উপর শুয়ে পড়েছিলেন। কান পেতে জেগে ছিলেন, নিদ্রা তাঁর আসে নি লল্লার সাড়ার জন্য। লল্লা কি ঘুমিয়েছে? ঘুমন্ত অবস্থায় গভীর দীর্ঘায়িত শ্বাস-প্রশ্বাস উঠছে কি? কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রহরী দুটির মৃদু নাসারব উঠতে শুরু করেছিল। কুড়ুমণির নাসাগর্জন প্রবল। লল্লা কি এখনও জেগে? কই, তার শ্বাস-প্রশ্বাস তো গভীর হয়ে ওঠে নি। উঠে গিয়ে দেখতেও সাহস হয় নি। কি জানি কখন কে জেগে উঠবে। সন্ধ্যায় ভোগ ও দীপারতির পর দেবতার শয়ন হয়, তারপর সে দ্বার প্রভাত পর্যন্ত খোলা হয় না। দরজা খুললে যদি শব্দে জেগে ওঠে! দরজা তিনি তালাবন্ধ আজ করেন নি এই জন্যই। ভেজানো আছে। তবু যদি দেখে, শব্দ হয়! রাত্রে প্রহরী দুটিকে গাছতলা দেখিয়ে দিতে পারেন নি। তারা বারান্দায় শুয়ে।

এরই মধ্যে তাঁরও তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ পায়ে কিছুর স্পর্শে তিনি জেগে উঠেছিলেন। চোখ মেলে চেয়ে দেখে তিনি যেন পাথর হয়ে গেলেন। লল্লা! লল্লা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছে। সে বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। তাঁর কণ্ঠ থেকে একটা চীৎকার বেরিয়ে আসতে চেয়েও পথ পেলে না। কে যেন তাঁর কণ্ঠ রোধ করে চেপে ধরেছে। লল্লা, কিন্তু

দাঁড়াল না, কোন কথাও বললে না, প্রণাম করেই লঘু পদে ঘর থেকে বেরিয়ে ঘর এবং বারান্দার মাঝের দরজায় ক্ষণেকের জন্য দাঁড়াল ; বাইরে পূর্ণিমার পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না, দুগ্ধ-শুভ্র স্বচ্ছতায় প্রকৃতি যেন ক্ষীরসমুদ্রে অবগাহন করে অমলধবল স্পষ্টতায় স্পষ্ট ; অদূরবর্তী সমুদ্রে পূর্ণিমার জোয়ার উঠেছে। তরঙ্গাঘাতের শব্দের সঙ্গে কল্লোলধ্বনি উঠছে। লল্লা মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে —বোধ হয় বারান্দায় ঘুমন্ত তিনজন মানুষকে দেখে নিয়ে সন্তর্পিত লঘু পদক্ষেপে তাদের পাশের খালি জায়গার উপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়ে নেমে গেল বারান্দা থেকে। উদ্যানে জ্যোৎস্নার মধ্যে ওকে স্পষ্ট দেখলেন। লঘু দ্রুত পদে লল্লা উদ্যান প্রবেশমুখে আশ্রমপ্রবেশের ফটকে গিয়ে দাঁড়াল। সেও ক্ষণেকের জন্য—তারপর সে বেরিয়ে দৃষ্টির অন্তরালে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল।

এতক্ষণে তাঁর স্তম্ভিত চেতনা ফিরল তড়িতাহতের মত। তিনি চীৎকার করতে চাইলেন, লল্লা! কিন্তু সংযত করলেন নিজেকে। এবং উঠে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। এই গভীর রাত্রি, এই রাত্রে একা কিশোরী লল্লা কোথায় যাবে? মাৎস্যন্যায়ের কাল। রাজশক্তি সারা দেশে ভেঙে পড়েছে। গ্রামে গ্রামে হিংস্রক চোর ডাকাত লম্পট ঘুরে বেড়ায় দল বেঁধে। শহরে কোম্পানীর তেলেঙ্গী সিপাই, গোরা সিপাই মদ খেয়ে সমুদ্রতটে হল্লা করে। ধনীর উদ্যান-বাটিকায় মত্ত কণ্ঠের স্খলিত বাক্য, তাল-ছন্দ-কাটা নূপুরধ্বনি নটরাজের অপমান করে। ভগবানের পৃথিবীতে ধ্যানমগ্ন ভগবানের অঙ্গে নিক্ষিপ্ত হয় অশুচি আবর্জনা—এই রাত্রে ও যাবে কোথায়? তার উপর আজ সারাটা দিন বৃশ্চিক-বিষে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল। মৃত্যু-যন্ত্রণার মত যন্ত্রণা ভোগ করেছে। ও যাবেই বা কতদূর? দ্রুতপদে তিনি আশ্রম থেকে বেরিয়ে এলেন। কই, কোথায় লল্লা?

জ্যোৎস্না-প্লাবিত পৃথিবী ; গাছের তলদেশে শুধু অন্ধকার। তিনি তাকালেন লল্লাদের গ্রামের পথের দিকে। কই? সারা বালুময় পথটা জ্যোৎস্নায় ঝিকমিক করছে। শূন্য পথ। মান্দ্রাজ যাবার পথের দিকে চাইলেন। সেদিকেও তাই। অনেক দূরে শহরের দুটো পাকা বাড়ি দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বলছে শীর্ষদেশে। বহু দূর থেকে ভেসে আসছে কয়েকটা কুকুরের চীৎকার। কিন্তু লল্লা কই? নেই তো! পূর্ব দিকে সমুদ্রবেলা। তবে কি এদিকে গেল! ছুটে এগিয়ে গেলেন তিনি। উঁচু বালুর বালিয়াড়ি ক্রমশ নিম্নভূমিতে নেমে গেছে। তার পরেই তাল নারিকেল সুপারি বনের সারি ; পূর্ণিমার চাঁদ মধ্যগগনে, গাছগুলির ছায়া তাদের পায়ের তলায় জমেছে ঘন হয়ে, মধ্যে মধ্যে পত্র-পল্লবের ফাঁক দিয়ে গড়া টুকরো টুকরো জ্যোৎস্না দীর্ঘ রশ্মিভল্লের মত ওই ছায়াকে বিদ্ধ করছে। বায়ু-তাড়নায় পল্লব-আন্দোলনে যেন উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে। হ্যাঁ, ওই যে, ওই চঞ্চল দোলায়মান জ্যোৎস্নার খণ্ডগুলি কখনও একটি মনুষ্য-মূর্তির মাথায়, কখনও পিঠে কখনও পায়ে পড়ছে। তার আভায় সর্বাঙ্গ আভাসে ছায়ামূর্তির মত দেখাচ্ছে। লল্লা চলেছে ওই নারিকেল তালের সারির কোল ঘেঁষে, ওরই ছায়ায় আত্ম-গোপন করে চলতে চাচ্ছে।

তিনি আবার চীৎকার করে ডাকতে গিয়ে থেমে গেলেন। প্রহরীরা জেগে উঠবে। তিনি নিজেই ছুটলেন। এসে দাঁড়ালেন নারিকেল তালের সারির মধ্যে। সামনে সমুদ্র, পূর্ণিমায় উত্তাল জোয়ারে উচ্ছ্বসিত। আঘাতের পর আঘাত করছে তটভূমিতে, এক একটা বৃহৎ উচ্চ তরঙ্গ আছড়ে পড়ে এই গাছগুলির তলদেশ পর্যন্ত চলে আসছে। একটা তরঙ্গ তাঁর পা ভিজিয়ে দিল।

ওই চলেছে লল্লা! ওই! টুকরো টুকরো আলোর মধ্যে রহস্যমূর্তির মত দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। তিনি আবার ছুটলেন দক্ষিণ মুখে। ওই মুখেই লল্লা চলেছে, সম্ভবত মহাবলীপুরমের

দিকে।

খানিকটা গিয়ে আবার তিনি দাঁড়ালেন। কতদূরে লল্লা! লল্লা, যেও না, এত দূর পথ! তুমি দুর্বল, তুমি যুবতী, এই গভীর রাত্রি। লল্লা, তুমি দাঁড়াও। কিন্তু কই, আর তো দেখা যাচ্ছে না!

স্বল্প উচ্চকণ্ঠে তিনি ডাকলেন—লল্লা!

সমুদ্রের কলরোলে ঢাকা পড়ে গেল। একটা ঢেউ আবার আছড়ে পড়ে এগিয়ে এসে তাঁর পা ডুবিয়ে দিল। আবার অগ্রসর হলেন। ডাকলেন—লল্লা!

এবার চোখে পড়ল, নারিকেল সারির ছায়ার মধ্যে সঞ্চরমাণ জ্যোৎস্নার একটি ফালি তাঁকে দেখিয়ে দিল একটি নারিকেল কাণ্ডে ঠেস দিয়ে বসেছে লল্লা। তার দেহের কাপড়ের কয়েকটি অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠল। লল্লা বসেছে। ক্লান্ত হয়ে বসতে বাধ্য হয়েছে। এ কি! এলিয়ে পড়ল যেন!

দ্রুতপদে তিনি এগিয়ে গেলেন। হ্যাঁ, লল্লা নারিকেল গাছের তলায় কাত হয়ে শুয়ে পড়েছে। একটু নত হয়ে তিনি ডাকলেন—লল্লা!

চমকে উঠল লল্লা—কে?

—ভয় নেই লল্লা, আমি।

—প্রভু! আপনি!

সে আবার স্থির হল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে—ভেবেছিলাম, পারব চলে যেতে। কিন্তু পারছি না। বড় দুর্বল বোধ হচ্ছে।

—কেন চলে এলে লল্লা? ছি ছি ছি!

রঙ্গনাথন বসলেন তার শিয়রে। মাথাটি তুলে নিলেন কোলে—তুমি বেরিয়ে এলে, আমি তোমাকে কথা বলতে পারলাম না ওরা জেগে উঠবে বলে।

তার ললাটে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন—দেখি তোমার নাড়ী।

মণিবন্ধটি হাতে নিয়ে পরীক্ষা করে বললেন—দুর্বল! এ দুর্বল অবস্থায় কি করলে বল তো!

লল্লা চুপ করে রইল শিষ্ট বালিকার মত।

রঙ্গনাথন ভাবলেন কি করবেন একে নিয়ে। মহাবলীপুরম অনেক দূর। মাদ্রাজ, তার নিজের গ্রাম, তার জন্য বন্ধনরজ্জু আর নির্যাতনের দণ্ড ধরে বসে আছে। জ্যোৎস্নার একটি মোটা টুকরো এসে পড়ল তাঁদের উপর। তিনি দেখলেন লল্লা একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। মুহূর্তে তাঁর দৃষ্টিও নিবদ্ধ হয়ে গেল লল্লার মুখের উপর। লল্লার চুল একরাশি এবং সেগুলি ঘন কুঞ্চনে কুঞ্চিত। চোখ দুটি আয়ত, প্রশান্ত, প্রসন্ন। শুভ্রচ্ছদ দুটি মুক্তাগর্ভ শুক্তির ভিতরদিককার মতই নীলাভ শুভ্র, গাঢ় কালো মুক্তার মতই তারা দুটি টলটল করছে। চন্দ্রালোকে দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

লল্লা বোধ হয় সচেতন হয়ে উঠল তাঁর দৃষ্টিতে। সে চোখ বুজল। রঙ্গনাথন ডাকলেন—লল্লা!

—প্রভু—

—কি ভাবছিলে লল্লা?

বলতে পারলেন না, কি দেখছিলে লল্লা আমার দিকে তাকিয়ে। কণ্ঠস্বর তাঁর গাঢ় হয়ে এসেছে। একটা উত্তাপ যেন তাঁকে উত্তপ্ত করে তুলছে। একটা মাদকতার ক্রিয়ার মত

ক্রিয়া তাঁকে যেন আচ্ছন্ন করছে। দেহের শিরায় রক্তের প্রবাহে মাথায় স্নায়ুর মধ্যে কি যেন উষ্ণতা; কিছু যেন; সমস্ত চিত্ত আচ্ছন্ন করবার মত তীব্র একটা কিছু বয়ে যাচ্ছে। মুদিত-চক্ষু লল্লার ললাটে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ফুটে উঠেছে। ললাটে হাত বুলিয়ে দিয়ে আবার ডাকলেন—লল্লা!

লল্লার ললাট শীতল। চোখ বুজেই অতি ক্ষীণ হেসে সে উত্তর দিল—ভাবছিলাম আপনিই আমার সাক্ষাৎ বরদরাজস্বামী।

আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। গভীর স্নেহে মুখটি আনত করে হঠাৎ থামলেন। আপন মুখের উপর তাঁর উষ্ণ নিশ্বাসের স্পর্শে চোখ মেললে লল্লা। বিস্ফারিত চোখে বললে—প্রভু!

রঙ্গনাথন উত্তর দিলেন না, বিরত হলেন না, তার ললাটে একটি চুম্বন দিয়ে বললেন—এ তোমার বরদরাজের আশীর্বাদ।

একমুহূর্তে কেঁদে আকুল হয়ে পড়ল লল্লা। শুধু বাক্যহীন রোদন।

রঙ্গনাথন তাঁর কাঁধ ধরে একটু আকর্ষণ করে বললেন—ওঠ। পারবে উঠতে?

মন্ত্রমুগ্ধার মতই লল্লা উঠল। রঙ্গনাথন বললেন—আমার কাঁধে ভর দাও। না পার তো বয়ে নিয়ে যাব। বল।

—কোথায় প্রভু?

—কেন আমার গৃহে।

—প্রভু—

—কোন ভয় নেই লল্লা।

—প্রভু, প্রহরীরা—

—কোন ভয় নেই। তোমায় ধরে নিয়ে যেতে পারবে না তারা। দেব না। ভেবো না তুমি।

—আপনার বিপদ হবে। না না—

—হবে না।

—কি বলবেন? কি করে বাঁচাবেন প্রভু? একটা ভিখারিণী শবরকন্যার জন্য আপনি সুদ্ধ জাতিচ্যুত হবেন।

—জাতিচ্যুত! না।

স্থির নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রঙ্গনাথন বললেন—না। তবুও তোমাকে ছেড়ে দেব না।

আবার বললেন উচ্চতর কণ্ঠে—না। তোমাকে কোন কালে ছেড়ে দেব না। না।

দৃষ্টি তাঁর উন্মাদের মত। দেহ তাঁর কাঁপছে। হাতে তাঁর অগ্ন্যুত্তাপ। শঙ্কিত কণ্ঠে লল্লা বললে—প্রভু!

রঙ্গনাথন বললেন—ভয় পেয়ো না। আমাকে ঘৃণা করো না লল্লা। প্রয়োজন হয় তোমার জন্য জাতিচ্যুত হব। আমি শবর হব। তোমাকে ছাড়তে আমি পারব না।

লল্লাকে সবলে বুকের মধ্যে আকর্ষণ করলেন রঙ্গনাথন। যৌবনের যে নিত্যলীলায় অকস্মাৎ একদা শীতান্তে, বাতাসের স্পর্শে গতি পরিবর্তিত হয়, সূর্যের স্পর্শে নব তাপের সঞ্চার হয়, পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে কামনা জাগে, সেই তাপে কামনায় রঙ্গনাথনের এত কালের সব সংকল্প ভেসে গেল।

লল্লার অধরোষ্ঠের উপর নিজের অধরোষ্ঠ স্থাপন করে মূক করে নিলেন তাকে, নিজেও মূক হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পর তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—কামনার কাছে আমি পরাজিত হয়েছি, মাথায় করে নিয়েছি তাকে, কিন্তু আমি কামার্ত পশু নই লল্লা। তোমাকে আমি বিবাহ করব।

নিজের গলা থেকে তুলসীর মালাখানি খুলে তার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন—সমুদ্র সাক্ষী রেখে তোমাকে বরণ করলাম আমি। প্রয়োজন হয় আমি জাতিচ্যুত হব। আমি জানি সমাজ জাতিচ্যুত করলেও বরদরাজ ত্যাগ করবেন না। একান্তে দূরে চলে যাব দুজনে। শবরী নয়, ব্রাহ্মণী হবে তুমি।

লল্লা তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। বললে—আপনিই আমার বরদরাজ।

—তুমি তা হলে লক্ষ্মী।

আবার তাকে তুলে বুকে ধরলেন। তারপর বললেন—চল।

—না। শান্ত কণ্ঠে লল্লা বললে—বড় ভাল লাগছে এখানে। কি সুন্দর চাঁদ! অপরূপ জ্যোৎস্না! সমুদ্রের কি রূপ!

—বেশ, এই সমুদ্রবেলাভূমে হোক আমাদের বাসর।

সস্নেহে রঙ্গনাথন লল্লাকে নারিকেল কুঞ্জতলে বসিয়ে দিয়ে তার পাশে বসলেন।

একটি উচ্ছ্বসিত উত্তাল তরঙ্গ বেলাভূমে আছড়ে পরে তাঁদের পা পর্যন্ত এসে স্পর্শ করে ফিরে গেল।

রঙ্গনাথন বললেন—আজ পূর্ণিমা, সমুদ্র উতরোল হয়ে উঠেছে।

* * * *

বালুচরে পাতা বাসরশয্যায় তাঁরা দুজনেই তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। ঘুম ভাঙল পাখীর কলরবে। সামুদ্রিক পাখীর দল ভোরের মরা জ্যোৎস্নায় দল বেঁধে চক্রাকারে উড়তে শুরু করেছে আকাশ থেকে ঝরে-পড়া শুভ্রদল আকাশকুসুমের মত। স্থলচারী বিহঙ্গেরা গাছের মাথায় মাথায় কলরব করছে। যে দু-একটি শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট গাছ আছে তার পত্রপল্লবের মধ্যে ছোট পাখীরা দলবদ্ধ শিশুর মত প্রভাতী কাকলীতে মুখর হয়ে উঠেছে। পূর্বে অন্তহীন সমুদ্রের যেখানে আকাশ সমুদ্র-জলে অবগাহনে নেমেছে—সেখানে দীর্ঘায়ত একটি পাণ্ডুর রেখা জেগেছে; তারই মধ্য-বিন্দুর ঈষৎ উত্তর দিকে একস্থানে সে পাণ্ডুরতা মণ্ডলাকারে ক্রমশ আয়তনে বাড়ছে। পূর্বদিগন্তে একপাদ আকাশে জ্যোৎস্না ম্লান বিবর্ণ হয়ে গেছে, আকাশের প্রথম পাদ-সীমার একটু উপরে শুকতারা নীলাভ জ্যোতিতে হাসছে।

এ পাশে পশ্চিম দিগন্তে দিগন্তশায়ী পূর্ণচন্দ্র। রক্তাভ পাণ্ডুর হয়ে এসেছে। কিন্তু তার জ্যোৎস্না এখনও পশ্চিমে দিগন্ত থেকে আকাশের ত্রিপাদ পর্যন্ত আলো করে রেখেছে। সে জ্যোৎস্না পড়ে রয়েছে শাখা-প্রশাখাহীন দীর্ঘশীর্ষ নারিকেল বৃক্ষগুলির পশ্চিম ভাগে, শীর্ষদেশ থেকে তলভূমি পর্যন্ত আলোকিত করে। পূর্বভাগে বালুচরে সমুদ্রগর্ভ পর্যন্ত জেগে রয়েছে অস্পষ্ট ছায়া। পশ্চিম দিগন্তাগত খানিকটা জ্যোৎস্না এসে পড়েছে শবরীর মুখের উপর। নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন লল্লা।

প্রথম ঘুম ভাঙল রঙ্গনাথনের। রাত্রি শেষ হয়েছে। আর এক দণ্ডের মধ্যেই ওই পাণ্ডুর মণ্ডলটি ঈষৎ রক্তরাগে ভরে উঠবে। তারপর সে রক্তরাগ একদিকে সমুদ্রের জল একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে পরিধিতে আকাশের ঊর্ধ্বলোক পরিব্যাপ্ত করবে এবং কেন্দ্রে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে হতে জবাকুসুমসঙ্কাশ সূর্য মাথা তুলবেন। যেন সমুদ্রবক্ষতল থেকেই সূর্যদেব উঠে

আসছেন। তারপর একসময় লাফ দিয়ে উঠবেন আকাশে, সমুদ্রের নীল তরঙ্গশীর্ষে রক্তরাগের ছটা বাজবে।

পাশে শবরকন্যা এখনও নিদ্রিতা। রঙ্গনাথন তার মুখের দিকে তাকালেন। বারেকের জন্য চিত্ত যেন নিজের উপরেই বিরূপ হয়ে উঠল রঙ্গনাথনের। ভাবাবেগে এ তিনি কাল কি করেছেন?

হে বরদরাজ, এ কি করলে! তোমার চরণতলে কাল বিষজর্জরা চেতনাহীনা এই কন্যাকে আশ্রয় দেবার সময় বলেছিলাম, এতে যদি অপরাধ হয় তবে সে অপরাধের দণ্ড আমাকে দিও। দোষ তো এর নয়। আমার। তুমি কি আমাকে মোহগ্রস্ত করে আমার ব্রত ভঙ্গ করিয়ে তপস্যাচ্যুত করিয়ে তারই দণ্ড দিলে? স্থির হয়ে গেছেন তিনি, পাষাণ হয়ে গেছেন যেন। দিবালোক যত স্পষ্ট হচ্ছে, পৃথিবী যত বাস্তব রূপে প্রকাশিত হচ্ছে তত তিনি যেন পঙ্গু হয়ে যাচ্ছেন। এ কি করেছেন তিনি! দয়া করতে গিয়ে এ কি বন্ধনে নিজেকে শৃঙ্খলিত করেছেন! লল্লাকে ডাকতে পারছেন না তিনি। চোখ মেলেই লল্লার নিদ্রা-জড়িমা-মুক্ত চোখে সমুদ্র-বক্ষে রক্তিম সূর্যের আবির্ভাবের মত প্রেমের দীপ্তি ফুটে উঠবে। তার সারা মুখ কোমল অনুরাগচ্ছটায় অনুরঞ্জিত হবে। সলজ্জ হাসির রেখায় ঠোঁট দুটি বিকশিত হবে। কি করবেন তিনি তখন?

লল্লার গলায় তাঁর গলার বৈষ্ণবজনের মালাটি পড়ে রয়েছে।

অকস্মাৎ রঙ্গনাথন যেন বেত্রাহতের মত অধীর হয়ে উঠলেন। লল্লাকে একটি বৃশ্চিকে দংশন করেছিল—তাঁর মনে হল তাঁকে যেন সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করেছে।

কি করবেন তিনি? লল্লা যেন এখনও তাঁকে বৃশ্চিকের মত ধরে আছে। লল্লার একখানি হাত তাঁর কোলের উপর সত্যই পড়ে ছিল। তিনি আতঙ্কিত ব্যক্তির মতই হাতখানাকে সজোরে কোল থেকে বালুচরের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। লল্লা সেই আঘাতেই চোখ মেলল। সদ্য ঘুম-ভাঙা দৃষ্টির মধ্যে আঘাতের বেদনাবোধও ছিল না। ছিল শুধু প্রসন্ন অনুরাগ। নিদ্রা-ঘোরের মধ্যে সে আঘাতটা পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে নি, এবং অনুমানও করে নি, বা করবার কোন কারণ ঘটে নি তার। চোখ মেলে চেয়ে সে স্মিতহাস্যে বললে—প্রভু! বোধ হয় তার মনে হয়েছিল রঙ্গনাথন তাকে ডাকছে। রঙ্গনাথন তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন। প্রভু বলে সাড়ার মধ্যে লল্লার প্রশ্ন ছিল—কি বলছেন প্রভু? কিন্তু রঙ্গনাথনের বলার কিছু ছিল না। পথিপার্শ্বে নিদ্রিত চোর যেমন ভোরের আলোয় জেগে উঠে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায় তেমনি ভাবে তিনি পালিয়ে গেলেন। লল্লা উঠে দাঁড়াল। তার বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এমন করে ছুটে পালালেন কেন? প্রহরী! চঞ্চল হয়ে উঠল সে। পরমুহূর্তেই তার সব চঞ্চলতা স্থির হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল—কাল রঙ্গনাথন তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন—কিসের ভয়? তুমি আমার পত্নী। তুমি যাবে আপনার গৃহে—

তা হলে? তা হলে?—

সে যে বিশ্বাস করতে পারছে না। তার কণ্ঠে যে এখনও তাঁরই পরানো মালা—বৈষ্ণব-জনের মালাখানি দুলছে! তবে?

পাথর-মূর্তির মতই সে দাঁড়িয়ে রইল। প্রহরীর ভয় আর তার নেই। নিয়ে যাক, তারা তাকে ধরে নিয়ে যাক। করুক, নির্যাতন করুক, লাঞ্ছনা করুক।

সূর্য উঠবে। একটি মণ্ডলাকার রক্তানুরঞ্জন ধীরে ধীরে আকাশলোকে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, পাখীরা দূরদূরান্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে চলেছে। সমুদ্রবক্ষে নৌকা দেখা দিয়েছে। দূর উত্তরে

মাদ্রাজ বন্দরে জাহাজের মাস্তুল দেখা যাচ্ছে। বড় বড় নৌকা পাল তুলে বের হচ্ছে। ছোট মাছ-ধরা নৌকা সারি সারি ছুটছে গভীর সমুদ্রের দিকে। মানুষের কোলাহল শোনা যাচ্ছে। সূর্য উঠছে। কিন্তু সে কোথায় যাবে? দিনের আলোয় কি করে সে পথে বের হবে? সে সব বুঝেছে। আর কিছু তার অগোচর নেই। এই হয়! এই বুঝি নিয়ম! সূর্য উঠল। আলো রৌদ্র হয়ে ফুটল—উত্তাপের স্পর্শ লাগল দেহে। সেই স্পর্শে সে সচকিত হয়ে উঠল। যেতে হবে—কোথাও যেতে হবে। অনেক দূরে, অনেক দূরে। পালাতে হবে তাকে। দ্রুতপদে সে বনবীথির ঘন-সন্নিবিষ্ট নারিকেল তালের কাণ্ডগুলির মধ্য দিয়ে চলতে লাগল। দক্ষিণ মুখে।

আবার সকালে জোয়ার আসছে। তার পদচিহ্নগুলি ধুয়ে দিয়ে গেল জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস।

* * * *

রঙ্গনাথন বেত্রাহতের মত ছুটে আসছিলেন।

প্রহরী দুজনও সকালে ঘুম ভেঙে তাঁকে না পেয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিল। তাঁকে দেখে আশ্বস্ত হল, কিন্তু তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে প্রশ্ন করলে—কি হয়েছে আচার্য? ভোরবেলা উঠে কোথায় গিয়েছিলেন? সমুদ্রকূলে বুঝি?

তিনি বললেন—অ্যাঁ—? হ্যাঁ।

বলেই তিনি তাদের পিছনে ফেলে প্রায় ছুটে এসে ঘরে আপন শয্যার উপর গড়িয়ে পড়লেন। সর্বাঙ্গের বালুকণা ঝরে পড়ল শয্যার উপর। কিন্তু তার পীড়া অনুভব তিনি করলেন না। মুখ গুঁজে পড়ে রইলেন।

এ কি মর্মপীড়া! এ কি করলেন! হে বরদরাজ! এ কি শাস্তি দিলে তুমি! আবার উঠলেন। উঠে ভাণ্ডার ঘরের দরজা ঠেলে পূজোর ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু প্রবেশ করতে গিয়েও প্রবেশ করতে পারলেন না।

স্নান করতে হবে তাঁকে। বেরিয়ে এলেন। কুড়ুমণিকে এবং প্রহরী দুটিকে বললেন—আমি স্নান করতে যাচ্ছি সমুদ্রে। মধ্যপথ থেকে ফিরে এলেন। যেতে পারলেন না। লল্লা—লল্লা নিশ্চয় নারিকেল কুঞ্জতলে এখনও পড়ে আছে। কাঁদছে। তাঁকে দেখলেই সে 'প্রভু' বলে এগিয়ে আসবে। পায়ের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদবে।

ফিরে এসে বললেন—না কুড়ুমণি, শরীর আমার অসুস্থ। সমুদ্রস্নান সহ্য হবে না। কূপ থেকে জল তুলে স্নান করে পূজোর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করলেন। ঘরখানি এখনও লল্লার অবস্থানের চিহ্নে মলিন হয়ে আছে। সযত্নে তিনি সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে পূজার আয়োজন করে পূজায় বসলেন। কিন্তু হ'ল না, পূজা হ'ল না। চোখ বন্ধ করলেই লল্লাকে দেখছেন। একটি দিনে লল্লা যেন শতমূর্তিতে নিজেকে তাঁর মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লল্লা গোশালার খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে আছে ম্লান-মুখে, সজল চোখে, ক্লিষ্ট শ্যাম-লতার মত।

লল্লা বিচালি স্তূপ থেকে যন্ত্রণাকাতর ভয়ার্ত-মুখে বের হয়ে আসছে।

লল্লা বৃশ্চিক-বিষে চেতনাহীন হয়ে ভেঙে পড়েছে।

লল্লা তাঁর বাহুর উপর।

লল্লাকে তিনি বরদরাজের সম্মুখে শুইয়ে দিয়ে বলছেন—তোমারই চরণপ্রান্তে একে সমর্পণ করলাম প্রভু। তুমি তাকে রক্ষা করতে পারবে না দেবতা? বুকের ভিতরটা তাঁর কেমন করে উঠল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে এল দরদর-ধারে। পরমুহূর্তেই তিনি চমকে উঠলেন। চোখ

দুটি খুলে গেল। বিস্ফারিত হয়ে উঠল। মনের ভিতর থেকে বিপরীত প্রশ্ন জেগে উঠল। দেবতা তো তাকে ওঁরই হাতে দিয়েছিলেন! দেবতা তো প্রতারণা করেন নি!

ওঃ! লল্লার সেই মুখ মনে পড়ছে। সেই দৃষ্টি মনে পড়ছে। তাঁর নিজের মালাখানি তার গলায় যখন পরিয়ে দিয়ে বলেছিলেন—কামনা আমার আছে, কিন্তু কামার্ত পশু নই আমি। লল্লা, তোমাকে ছাড়তে পারব না আমি। এই মালা পরিয়ে তোমাকে সমুদ্র সাক্ষী রেখে বরণ করছি—তুমি আমার পত্নী—সেই মুহূর্তের লল্লার সেই অপরূপ সুষমা-দীপ্ত, প্রসন্ন-ক্লান্ত মুখখানি মনে পড়ছে। সারা ঘরখানিতে এখনও লল্লার দেহগন্ধ পাচ্ছেন তিনি।

লল্লা, লল্লা, লল্লা। সারা অন্তর ভরে লল্লাকে আহ্বান করে উঠল তাঁর হৃদয়। লল্লা! লল্লাকে তিনি ভালবাসেন। লল্লাকে তিনি পত্নী বলে গ্রহণ করেছেন। বরদরাজের যে প্রেরণায়, যে ইঙ্গিতে ওই গান তিনি রচনা করেছিলেন—কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে যে দেবতা বাস করেন—সেই দেবতাই বাস করেন বৈকুণ্ঠে—যে দেবতা বাস করেন বৈকুণ্ঠে—তিনিই বাস করেন কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে—সেই প্রেরণাতে তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন। হৃদয়ের অকপট, অকৃত্রিম, ছলনাহীন কামনা—যে কামনার পুণ্যে নারী পূর্ণ হয় পুরুষের মধ্যে, পুরুষ পূর্ণ হয় নারীর মধ্যে—সেই অকৃত্রিম পবিত্র কামনায় কাল তিনি তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। ভুল—ভুল করেছেন তিনি পালিয়ে এসে। ভুল। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে। ভুল সংশোধন না হলে জীবনের সে ক্ষতি আর পূর্ণ হয় না।

হে বরদরাজ—এ কি মতিভ্রান্তিতে তুমি ছলনা করলে?

কেন? কেন? কেন এমন ভ্রান্তি হল তাঁর? এত বড় আঘাতে তিনি বিচলিত হন নি, মিথ্যা বলেন নি। কারুর ভয়ে তাঁর উপলব্ধ সত্যকে অসত্য বলেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনের চরমতম সত্যকে কি করে, কেন তিনি এই ভাবে মুহূর্তের ভ্রান্তিবশে সাগর বালুবেলায় ফেলে দিয়ে চোরের মত পালিয়ে এলেন?

আসন ছেড়ে উঠে পড়ছিলেন। আবার বসলেন। প্রণাম করে বললেন—লল্লাকে ফিরিয়ে আনতে চললাম প্রভু। লল্লা আমার জীবনের চরম সত্য। তাকে আমি ভালবাসি। তাকে আমি চাই তোমার প্রসাদের মত। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি চললেন সমুদ্রতটের দিকে। প্রহরী দুটিকে বললেন—আমি চললাম সমুদ্রতটে। তটভূমি ধরে আমি যাব মান্দ্রাজ পর্যন্ত। তোমরা ফিরে যাও।

কুড়ুমণিকে বললেন—ঘর রইল। ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

সাগর তটভূমে এসে দাঁড়ালেন।

রৌদ্র-ঝলমল সাগরজল—রৌদ্র এবং রৌদ্রকরোজ্জ্বল সাগরজলচ্ছটায় প্রদীপ্ত বেলাভূমি পরম শুচিতায় পরিমার্জিত দেবতার অঙ্গনের মত প্রসারিত। নারিকেল সুপারি বৃক্ষের তরবারির মত দীর্ঘ পাতাগুলি ঝিকমিক করছে। সরসর সরসর শব্দ উঠছে তাদের আন্দোলনে। সমুদ্র-কল্লোল অবিরাম—অশ্রান্ত। কাঁদছে—

কান্নাই মনে হচ্ছে তাঁর এই মুহূর্তে।

শূন্য বালুচরে লল্লা তো নেই।

তিনি হাঁটতে শুরু করলেন—উত্তর-মুখে।

প্রথমে যাবেন লল্লাদের গ্রামে। তারপর মান্দ্রাজে। মান্দ্রাজে মায়লাপুরে—পার্থসারথি মন্দিরে দেখবেন। তারপর মহাবলীপুরম। তারপর কাঞ্জীভরম। লল্লাকে না পেলে যে হবে না তাঁর! নাহলে যে সব মিথ্যে হয়ে যাবে! জীবন মিথ্যা হয়ে যাবে!

* * * * *

বেলা প্রথম প্রহর পার হচ্ছে। সমুদ্র নৌকোয় নৌকোয় ভরে গেছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়েই ভাবছিলেন তিনি। একটি বড় যাত্রীবাহী নৌকা থেকে হাত তুলে কারা নমস্কার করলে। তাদের মধ্যে গৈরিকধারিণী এক প্রৌঢ়া। তিনি চিনলেন। পুরী থেকে ফেরার পথে পার্থসারথি দর্শনের জন্য মান্দ্রাজে নেমেছিল। সেদিন রাত্রে গান শুনে প্রৌঢ়া এসে তাঁকে হাত ধরে বলেছিল, শতায়ু হও। তারা ফিরছে আজ। পথে সমুদ্রতটে তাঁকে দেখে চিনে অভিবাদন করছে। কিন্তু চিন্তামগ্ন রঙ্গনাথন যেন দেখেও দেখলেন না। প্রত্যভিবাদন না করেই উত্তর-মুখে হাঁটতে শুরু করলেন। লল্লা। লল্লা। যোশেফদের গ্রামের প্রবেশ-পথে থমকে দাঁড়ান নি—কিন্তু যোশেফের বাড়ির দরজায় থমকে দাঁড়ালেন। গ্রামের পুরুষেরা অধিকাংশই বাইরে গেছে কাজে। মেয়েরা বিস্মিত হল। তাঁর পথ থেকে সরে দাঁড়াল, আপন আপন ঘরের ভিতর গিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগল। আচার্য একজন প্রবেশ করেছেন তাদের গ্রামে। চোখমুখে তাদের উত্তেজনা ফুটে উঠল।

—হে বরদরাজ! হে মহেশ্বর!

খৃষ্টানেরা ঘরে ঢুকল না, পথের পাশে সরে দাঁড়াল। রঙ্গনাথন যত অগ্রসর হলেন যোশেফের দরজার দিকে তত যেন দুর্বল হয়ে পড়তে লাগলেন। অকস্মাৎ এক সময় যেন সম্পূর্ণ পরাভূত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর বুকের ভিতর আলোড়ন উঠেছে আবার। কি বলবেন তিনি? কি করে বলবেন? কি করে বলবেন লল্লাকে তিনি কাল রাত্রে সমুদ্র সাক্ষী করে—শেষ হল না মনের প্রশ্ন। একজন খৃষ্টান যুবক উত্তেজিত উদ্ধত ভঙ্গিতে পাশের গলিপথ থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে। মুষ্টি উদ্যত করে বললে—কেন প্রবেশ করেছ তুমি আমাদের পল্লীতে? কি প্রয়োজন তোমার? গোক্ষুর সর্প, কাকে দংশন করতে এসেছ?

চোখ বুজলেন রঙ্গনাথন। মনে মনে বরদরাজকে স্মরণ করে নিজের মন দৃঢ় করতে চেষ্টা করলেন। মনের মধ্যে যে অগ্নি জ্বলছিল, যার শিখা গ্রামে প্রবেশ করার থেকেই নিভে আসছে ধীরে ধীরে, তাতে আবেগ এবং সংকল্পের ইন্ধন ও হবি দিয়ে তাকে জ্বালাবার চেষ্টা করলেন।

যুবকটি বললে—তোমাকে কে আঘাত করলে আর তুমি নাম করলে আমাদের!

চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন, বললেন—না। আমি কারও নাম করি নি। আমি কাউকেই তাদের চিনতে পারি নি। অসত্য আমি বলি না।

ধীরে ধীরে পাশে লোক এসে জমেছিল। তাদের মধ্যে থেকে একটি নারী-কণ্ঠস্বর বলে উঠল—উনি বলেন নি, বলেছে লল্লা। সমস্ত খৃষ্টানদের সে শত্রু। শবরদেরও সে ঘৃণা করে—সেই বলেছে। আমি গোড়া থেকে বলছি। তার কথাতেই কোতোয়ালীতে আমাদের জোয়ানদের ধরেছে।

রঙ্গনাথনের মনে আগুন জ্বলল আবার। তিনি প্রশ্ন করলেন—কাকে ধরেছে? কবে ধরেছে?

—মান্দ্রাজ শহরে থাকে আমাদের যে সব জোয়ানরা তাদের দশজনকে ধরেছে আজ ভোরে। লোক এই কিছুক্ষণ আগে সংবাদ এনেছে।

আর একজন বললে—ন্যাকা সাজছে। কিছু যেন জানে না।

অন্য জনে বললে—গ্রামে ও এসেছে আমাদের মুখ দেখে চিনতে। ওকে ধর ধর—ঘরে বন্ধ কর। রাত্রে—

কলরব করে উঠল লোকেরা। কিছু লোক পালিয়ে গেল। রঙ্গনাথন তখন মনের বল ফিরে পেয়েছেন। বললেন—বরদরাজের নাম নিয়ে বলছি—আমি কিছুই জানি না। লল্লাও কিছু জানে না। জান তোমার লল্লা কোথায়? তাকে কি তোমরা সন্দেহ করে আটকে রেখেছ? দোহাই তোমাদের, সত্য বল?

নির্ভীকতা শুধু আক্রমণকারীকে প্রতিহত করে না, খানিকটা পশ্চাৎপদও করে দেয়। এই নির্ভীকতার সঙ্গে সহৃদয় আকুতি থাকলে আক্রমণকারীর বিদ্বেষকেও নষ্ট করে। বিস্ময় জাগায়।

তাই হল। এরা রঙ্গনাথনের কথায় স্তব্ধ হয়ে সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। রঙ্গনাথন বললেন—আমাকে একটি সত্য কথা বল—লল্লা কোথায়? আমি নিজে এখনি কোতোয়ালীতে যাচ্ছি। নিশ্চিন্ত থাক—আমি মিথ্যা বলব না। তারা সঙ্গে সঙ্গেই ছাড়া পাবে। বল।

একজন প্রৌঢ় এসে বললে—মেইরীর নামে শপথ করে বলছি আচার্য, লল্লা কোথায় আমরা জানি না। সে তো গ্রাম পরিত্যাগ করেছে তার মায়ের মৃত্যুর পর।

—আজ! আজ সকালে! আজ সকালে সে আসে নি?

—না আচার্য। শপথ করে বলছি। বিশ্বাস করুন।

রঙ্গনাথন আর দাঁড়ালেন না। তিনি মান্দ্রাজের পথে ছুটলেন।

এ কি বাধা, এ কি বিঘ্ন তাঁর গতিকে অন্যদিকে ভিন্ন মুখে আকর্ষণ করছে! লল্লার সন্ধান থেকে বিরত হয়ে তাঁকে যেতে হবে কোতোয়ালী। সেখানে তারা যে কি করবে—কতক্ষণ তাঁকে আটকে রাখবে কে জানে। লল্লা কোন দূরদূরান্তরে ছুটে পালাচ্ছে লজ্জায়, ঘৃণায়—তাঁর প্রতি ঘৃণায়। লল্লাকে যে তাঁকে ধরতে হবে—বলতে হবে, লল্লা, আমি বুঝেছি; লোক-লজ্জার ভ্রান্তি আমার কেটেছে, সমাজের ভয় আমার নেই। তোমার মধ্যে আমার জীবনের লালসাকে তো নয়—আমার ভালবাসাকে পেয়েছি—ভালবাসার কাছে ভ্রান্তি ভয় সব তুচ্ছ। আমাকে ক্ষমা কর। ফিরে এস।

সে পথে এ কি বাধা!

কোতোয়ালীতে তখন শ্রীনিবাসন তাঁর প্রতীক্ষা করছিলেন। এর মধ্যে তাঁর কাছে সওয়ার চলে গেছে। কোতোয়ালীর কর্মচারীরা গোপন তদন্ত করে দশজন শবর খৃষ্টান এবং পাঁচজন শৈবকে ধরেছেন। এরা নামে শৈব হলেও ধর্মের কোন ধার ধারে না—আসলে দুষ্ট-প্রকৃতির লোক।

শ্রীনিবাসনের ঘরের বারান্দায় যোশেফ বসে আছে, একজন ফাদার বসে আছেন। মায়লা-পুরের শিবমন্দিরের একজন প্রতিনিধি বসে আছেন। আচার্য চিদম্বরমও এসেছেন।

শ্রীনিবাসন বললেন—কোথায় গিয়েছিলেন আচার্য? সওয়ার ফিরে এসে বললে, আপনি মান্দ্রাজ রওনা হয়েছেন প্রাতঃকালে পূজা সেরেই?

রঙ্গনাথনের দৃষ্টির মধ্যে একটি প্রখরতা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

লল্লার কামনা—নিজের অনুশোচনা তাঁকে অধীর করে তুলেছে। একটা উন্মত্ত বিদ্রোহ তাঁকে ক্ষিপ্তপ্রায় করে তুলেছে। নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, সমাজ ধর্ম সবকিছুর বিরুদ্ধে। কোতোয়ালীর বিরুদ্ধেও। কারণ কোতোয়ালী লল্লাকে খুঁজছে। মিথ্যা সন্দেহে খুঁজছে। যোশেফের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, আচার্য চিদম্বরমের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। সবাই সবাই যেন হেতু—

যার জন্য তিনি লল্লাকে ফেলে কুৎসিত প্রকৃতির ভীরু চোরের মত পালিয়ে এসেছেন। মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন জাগছে একটা; আশ্চর্য, একটি নারীর জন্য একি উন্মত্ততা! সঙ্গে সঙ্গে সে উন্মত্ততা প্রবলতর হয়ে চীৎকার করে উঠেছে—হ্যাঁ, লল্লাকে না পেলে আমি উন্মাদ হয়ে যাব। এখন অর্ধোন্মাদ। পরে পূর্ণোন্মাদ হয়ে যাব।

প্রখর কণ্ঠেই বললেন রঙ্গনাথন—আপনি রাজকর্মচারী। আপনি আপন অধিকারের মানুষদের রাজকর্মের প্রয়োজনমত চালিত করতে চান। কিন্তু মানুষের হৃদয় তো সে প্রয়োজনে চলে না। বরদরাজের অনুজ্ঞায় হৃদয়ের প্রয়োজনে আমি গিয়েছিলাম যোশেফদের পল্লীতে। সেখানে সংবাদ পেলাম আপনারা সন্দেহবশে কয়েকজন মান্দ্রাজের বাসিন্দা ওই গ্রামের যুবকদের ধরেছেন। কয়েকজন শৈবধর্মানুরাগীকেও ধরেছেন। সংবাদ পেয়েই আমি ছুটে আসছি। আমি তো বার বার বলেছি—আমি তাদের কাউকে চিনতে পারি নি এবং সন্দেহও কাউকে করি না। সুতরাং কেন অনর্থক সন্দেহবশে—

বাধা দিলেন শ্রীনিবাসন—আচার্য রঙ্গনাথন, দেশের আইন যা তা আপনি মানতে বাধ্য। ধর্মত বাধ্য। নন কি?

চুপ করলেন রঙ্গনাথন। একটু নীরব থেকে বললেন—বেশ, বলুন কি করতে হবে?

—যাদের সন্দেহবশে আমরা ধরেছি তাদের দেখুন। চিন্তা করে মনে মনে মিলিয়ে বলুন, কারও সঙ্গে আকার আয়তন অবয়ব দৃষ্টিগত কোন সাদৃশ্য আছে কি না?

—চলুন।

কোতয়ালীর পশ্চাৎভাগে একটি খোলা জায়গায় প্রহরাধীন লোক কয়েকজনকে এনে দাঁড় করানো হল। রঙ্গনাথন সামনে এসে দাঁড়ালেন।

শ্রীনিবাসন বললেন—ভাল করে দেখুন।

রঙ্গনাথন তাকালেন তাদের দিকে। বিচিত্র। একবার মুখখানা পাংশু হল—পরমুহূর্তে কঠিন হল, পরমুহূর্তে মাথাটা ঝাঁকি দিলেন অকারণে। খৃষ্টান শবরদের দেখা হয়ে গেলে বললেন—না, মাননীয় শ্রীনিবাসন, আমি কারুর সঙ্গে কোন মিল দেখতে পাচ্ছি না। এরা কেউ নয় বলেই আমার বিশ্বাস।

মানুষগুলির মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটল একমুহূর্তে। স্মিত হাসি ফুটল মুখে—প্রসন্ন হয়ে উঠল মুখ। দৃষ্টি এমন কিছু বললে যা রঙ্গনাথনের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠল।

শ্রীনিবাসন বললেন—ছেড়ে দাও এদের। চলুন, এবার ওদিকে চলুন। খানিকটা দূরে দাঁড়িয়েছিল শৈবধর্মানুরাগীরা। সেখানেও সেই একই ঘটনা ঘটল।

রঙ্গনাথন বললেন—এবার আমাকে মুক্তি দিন, আমি যাই।

শ্রীনিবাসন বললেন—আপনি ইচ্ছাপূর্বক চিনতে চাইলেন না রঙ্গনাথন।

—ইচ্ছাপূর্বক চিনতে চাইলাম না? প্রশ্ন করলেন। বোধ হয় নিজেকেই করলেন। তারপর বললেন—না।

—আর যেন দোষীকে ধরতে না পারার জন্য আমাকে দোষ দেবেন না।

—না। দিই নি, দেব না। আমি আসি মাননীয় রাজপ্রতিনিধি। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

—কোথায় যাবেন?

—আমি? ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বললেন—ঠিক জানি না। উদ্দেশ্যহীন যাত্রা শ্রীনিবাসন! বিস্মিত হবেন না। বরদরাজের অনুজ্ঞা—হৃদয়ের নির্দেশ আমাকে তাড়না করে ছোটাচ্ছে।

বাইরে আসতেই পাদ্রীটি উঠে বললেন—আপনি সত্যবাদী। ঈশ্বর আপনার উপর খুশী হবেন। ধন্যবাদ আপনাকে।

যোশেফ বললে—আচার্য রঙ্গনাথন, আপনাকে শ্রদ্ধা করি আমি। আমরা এ কথনও ভুলব না।

রঙ্গনাথনের চোখ দুটি মুহূর্তের জন্যে বিস্ফারিত হল—কোন চিন্তার প্রতিফলন পড়ল। তার পর বললেন—একটা অনুরোধ করব তোমাকে?

—বলুন আচার্য। আমরা অকৃতজ্ঞ নই।

—লল্লা যদি ফিরে আসে তাকে বলো সে যেন আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার জন্যে আমার ঘরে অপেক্ষা করে। বলো আমার পূজোর ঘরে যে বরদরাজের ছোট মূর্তি আছে—তার সেবার অধিকার তাকে আমি দিয়ে গেলাম।

—আচার্য! প্রবল বিস্ময়ে অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল যোশেফ। সমবেত জনমণ্ডলীরও বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রঙ্গনাথনের চোখে অর্ধোন্মাদের চোখের অস্বাভাবিক দৃষ্টি। তিনি বললেন—কাল রাত্রে আমায় বরদরাজ এই আদেশ করেছেন।

—বরদরাজ আদেশ করেছেন?

ওদিক থেকে আচার্য চিদম্বরম বলে উঠলেন—হাঁ-হাঁ, করবেন বই কি! কালের মহিমা। কলিযুগ, হিন্দুকাল বহুদিন বিগত, মুসলমানকালেও দেবতা এমন আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন নি। এবার এসেছে শ্বেত ইংরাজ। এবার দেবতাদেরও ম্লেচ্ছাচারে অনাচারে রুচি না হলে কাল-মহিমা প্রকট হবে কেন? কিন্তু আচার্য রঙ্গনাথন—দেবতার এ আদেশ আমরা মানব না। দেবমূর্তি কলুষিত হলে আমরা তা নিক্ষেপ করি নদীগর্ভে। সমুদ্রগর্ভে। এই কলুষ-অশুচি-অভিলাষী তোমার দেবমূর্তিটাকে তুমি সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ কর—নতুবা তোমাকে ক্ষমা করব না আমরা। তুমি পতিত—শবরতুল্য হলে আজ থেকে।

রঙ্গনাথন বললেন—জয় বরদরাজ স্বামী! তোমার অমৃত প্রসাদ আমাকে দাও। হে প্রভু!

তিনি বেরিয়ে এলেন কোতয়ালী থেকে। চললেন পার্থসারথির দিকে।

মন্দিরে তিনি ঢুকলেন না। যেদিকে ভিক্ষার্থীরা থাকে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—লল্লাকে দেখেছ?

—না তো প্রভু।

মায়লপুরে কপালীশ্বর শিবনিকেতনের আশপাশের ভিক্ষার্থীদেরও ওই প্রশ্ন করলেন—লল্লা? লল্লা কোথায় জান?

—কই, না তো!

চল, তবে মহাবলীপুরম। পথ চলতে চলতে হঠাৎ স্মরণ হল একবস্ত্রে কপর্দকহীন হয়ে বেরিয়ে এসেছেন তিনি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। তারপর আবার চলতে শুরু করলেন। এই ভাল। এই শ্রেয়। ফিরে গিয়ে অর্থ এবং কাপড়চোপড় আনতে যে সময় যাবে তার মধ্যে লল্লা কত—কত দূরান্তরে চলে যাবে। লল্লার জন্য তিনি অধীর উন্মাদ হয়ে যাচ্ছেন মুহূর্তে মুহূর্তে। ধর্ম নয়, কর্তব্য নয়, তার থেকেও বড় কিছু। জীবনের তৃষ্ণা—শুধু তৃষ্ণা নয়, অমৃত তৃষ্ণা!

চলো মহাবলীপুরম—

মহাবলীপুরমেই বা কই লল্লা? সে তো আসেনি।

চলো কাঞ্জীভরম—

কাঞ্জীভরমেই বা কই লল্লা? কাঞ্জীভরমে শুধু এইটুকু শুনলেন—তাঞ্জোরে অনেক যাত্রী গেছে। ভিক্ষুক দলও গেছে। সেখানে বিরাট উৎসব।

চলো তাঞ্জোরে। একমাত্র বস্ত্র ধূলি-মলিন হয়ে গেল; দাড়িগোঁফে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল মুখ; পাদুকা ছিন্ন হয়ে গেল, ফেলে দিলেন। উত্তরীয়খানি থেকে তৈরী করলেন ভিক্ষার ঝুলি। গান রচনা করলেন—সুর যোজনা করলেন, সেই গান গেয়ে ভিক্ষাজীবী রঙ্গনাথন চললেন। অমৃতপ্রসাদ দাও হে দাও—জয় বরদরাজ হে! হায়, কোথায় অমৃত প্রসাদ!

হায়—কোথায় অমৃত প্রসাদ!

অমৃত হয়তো কথার কথা। না, একবার তো তার সৌরভ অনুভব করেছিলেন। মুখের কাছে পাত্রখানি ধরে মুগ্ধ হয়ে বসেই ছিলেন; তারপর ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর আর মিলল না। সম্ভবত একবারই মেলে। যে পান করে সে অমর হয়—যে ফেলে দেয় তার আর মেলে না। তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী শোষণ করে নেয়; অথবা পরিত্যক্ত পাত্রের আধেয় বাতাস রৌদ্র পান করে ধন্য হয়। পড়ে থাকা পাত্রখানিতে তার আর কোন চিহ্ন পর্যন্ত মেলে না। শূন্য পাত্রখানি হাতে নিয়ে তখন উপলব্ধিতে আসে আসল সত্য। 'সব মিথ্যা' এইটেই সত্য।

* * *

জীবনে এই কয়েক বৎসরের মধ্যে যে কতবার এই কথা রঙ্গনাথনের মনে হল—তার সংখ্যা তাঁর মনে নেই। তাঞ্জোরে মনে হয়েছে। মাদুরায় মনে হয়েছে। প্রতি স্থানেই মনে হয়েছে এই কথা। আজও নিজের বীণাখানির উপর হাত রেখে এই কথাই ভাবলেন।

চার বৎসর পর। চার বৎসরের মধ্যে বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে তাঁর জীবনে। সংসারে সব মিথ্যা। তাঞ্জোর গিয়ে তিনি বিতাড়িত হলেন—মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করতে পেলেন না। তাঁর আসবার পূর্বেই মান্দ্রাজে আচার্য চিদম্বরমের দণ্ডের কথা তাঞ্জোরে পৌঁছে গিয়েছিল। মহাবলীপুরম যখন পৌঁছেছিলেন—তখন সেখানে বার্তা পৌঁছয় নি। তিনিই সেদিন সেই মুহূর্তের প্রথম যাত্রী মান্দ্রাজ থেকে মহাবলীপুরমমুখে। কাঞ্জীভরমেও তিনি যাত্রা করতে বিলম্ব করেন নি। কাঞ্জীভরম থেকে যাত্রা করে পথে তিনি বিলম্ব করেছিলেন। তিনি সমুদ্রতটের দিকে ফিরেছিলেন পথ থেকে। খোঁজ করতে চেয়েছিলেন তটভূমে এমন একটি কিশোরীর মৃতদেহ কি কেউ পড়ে থাকতে দেখেছে?—কয়েক দিন পর মনে হয়েছিল—না। সে তা করবে না। তার বাবা তাকে বলে গেছে—সে বরদরাজের প্রসাদ পাবে। তার মা তাকে বলে গেছে—কোন দেবমন্দিরের চারিপাশ মার্জনা করে গোপুরমের বাইরে দাঁড়িয়ে তার সুন্দর কণ্ঠে বন্দনা গাইলেই জীবন চরিতার্থ হবে। সে তো সমুদ্রে ঝাঁপ খাবে না। আবার ফিরে তাঞ্জোরেই গিয়েছিলেন। তখন তিনি একেবারে ভিক্ষুক।

গোপুরমের বহির্দেশে কাঞ্জীভরমের একজন শৈবপাণ্ডা একদল তীর্থযাত্রী সঙ্গে করে তাঞ্জোরের শিবমন্দিরের পাণ্ডাদের হাতে দিচ্ছিলেন। তিনি ওঁকে দেখেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। এই ব্যক্তি তার নিজের বরদরাজ মূর্তিকে খৃষ্টান শবরদের হাতে দিয়েছে। নিজে খুঁজে বেড়াচ্ছে এক শবরীকে। এ লোকটা গায়ক কিন্তু কি গান করে জান? গান করে শবর ব্রাহ্মণে ভেদ নেই। এ পাষণ্ড, পাষণ্ড—! এর পদার্পণে মন্দির অপবিত্র হবে!

মন্দিরে তিনি প্রবেশ করেন নি। প্রয়োজনও ছিল না। লল্লা থাকলে মন্দিরের বাইরেই

থাকবে। কিন্তু ব্রাহ্মণরা ইঙ্গিতে ও বক্র বাক্যে নানান জনে তাঁকে নানা লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত করেছিল। বিদ্রূপের আর অন্ত ছিল না। ভেঙে পড়েছিলেন আর একবার।

লল্লার জন্য আর এমন করে উন্মাদের মত ঘুরবেন না। ফিরে যাবেন মান্দ্রাজে। একটি বৃক্ষতলে সারারাত্রি পড়ে ছিলেন। মধ্যে মধ্যে মনে মনে বলেছিলেন—হল না। পারলাম না। লল্লা, লল্লা।

পরদিন তাঞ্জোর ত্যাগ করে মান্দ্রাজের পথে খানিকটা এসে আবার ফিরেছিলেন। লল্লাকে না পেলে বেঁচে তাঁর লাভ নেই। এর পর কিন্তু তাঁর আর সন্ধানে কোন শৃঙ্খলা ছিল না। পথে পথে চলেছিলেন, যে দিকে বেশী লোক চলে সেই দিকে—সে পথে যে স্থান পড়ে, সেই স্থানেই তাকে খুঁজেছেন। গান গেয়ে ভিক্ষা করেছেন, কিছু সঞ্চয় করেছেন, আবার চলেছেন।

এমনি করে আট মাস ঘুরেছিলেন। তিনি তখন প্রায় উন্মাদ।

সারাদেশে অরাজক। একে একে হিন্দুমুসলমান রাজবংশ সামুদ্রিক ঝড়ে সমুদ্রতটের নারিকেল তালবৃক্ষের মত উৎপাটিত হয়ে পড়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির ভাই কর্নেল ওয়েলেসলি ঝড়ের মত বিক্রম নিয়ে একের পর এক মারহাট্টা টিপুসুলতান ত্রিবাঙ্কুর রাজশক্তিকে পরাভূত করছে। ওদিকে পিণ্ডারী, ঠগ চোর-ডাকাতে দেশ পরিপূর্ণ। এর মধ্যে পূর্ণোন্মাদ বলেই তাঁর ঘোরা সম্ভবপর হয়েছিল। দেহের শ্রীও তখন পথের ধূলায় ঢাকা পড়েছে; মলিন বেশবাস এবং কাঁধের ভিক্ষার ঝোলাই ছিল আত্মরক্ষার বর্ম। আর একটি অস্ত্র ছিল। সে তাঁর গান। যেই হোক—গান শুনে তারা করুণাই করেছে। তারপর এক ঘটনা ঘটল। তিনি তখন শ্রীরঙ্গমে। সেই অবস্থাতেই গোদাদেবীর উপাখ্যান নিয়ে গান রচনা করে মুখেই শুধু গেয়ে ভিক্ষা করতেন। তাঁর বড় ভাল লেগেছিল এ উপাখ্যান। বিষ্ণুভক্ত পারিয়ার কন্যা গোদা; স্বপ্নাদেশ দিয়ে শ্রীরঙ্গনাথস্বামী পারিয়ার কন্যা গোদাবরীকে বিবাহ করেছিলেন। এ কাহিনীর মধ্যে কোথায় যেন লল্লার সঙ্গে মিল দেখতে পেতেন। মধ্যে মধ্যে ভাবতেন—লল্লা আর নেই। লল্লা তাকে বলেছিল বরদরাজ।—তার সে ভুল ভেঙে দিয়েছেন বরদরাজ। রঙ্গনাথনকে দিয়েই নিজের স্বরূপ নিজে খুলিয়ে দিয়েছেন। এবং তাকে টেনে নিয়েছেন। লল্লাও গোদাবরী কন্যার মত মরদেহ থেকে মুক্ত হয়ে বরদরাজের সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। যিনি শ্রীবরদরাজ তিনিই শ্রীরঙ্গনাথন। অর্থ তাঁর কিছু জমেছিল। শ্রীরঙ্গনাথস্বামীর বিশাল মন্দিরের স্তরে স্তরে বিন্যস্ত চত্বরের মধ্যে পাগলের মত খুঁজতেন—লল্লা! লল্লা! লল্লা!

একদিন একজন লোক তাঁকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল—বাঈ সাহেব ডাকছেন। প্রশ্ন করেছিলেন ক্রুদ্ধ ভাবেই—কে বাঈ?

নাম শুনে সম্ভ্রমে মাথা নত করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে সে নাম তাঁর স্মরণে ছিল। বিখ্যাত সরস্বতী বাঈ; সঙ্গীতজ্ঞদের আত্মা। মা। তিনি শ্রীরঙ্গনাথস্বামী দর্শনে এসেছেন, দুদিন তাঁর গান শুনেছেন। শুনে ডেকেছেন।

পক্ককেশী বৃদ্ধা সরস্বতী বাঈ। তিনি তাঁকে পুত্র বলে সম্বোধন করেছিলেন। প্রশ্ন করেছিলেন—এমন মূলধন থাকতে ভিক্ষা কর কেন? প্রথমটা রঙ্গনাথন মৌন ছিলেন। তারপর ধীরে ধীরে হৃদয়ের উত্তপ্ত স্পর্শে বিগলিত হয়েছিলেন।

তিনি তাঁর পিঠে মলিন বস্ত্রের উপর পরম স্নেহে হাত রেখে বলেছিলেন—দেবতাকে খোঁজ?

তিনি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন—সে কি মেলে পুত্র? আমি তো বলতে পারব না। জানি না। আমার জীবনে তো—। একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—প্রথম জীবনে রূপ আর কণ্ঠের জন্য বিক্রী হয়েছিলাম। রাজা সুলতানের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে দেখলাম মনোরঞ্জন করা যায়, সেও অল্প ক্ষণ বা দিনের জন্যে। সম্পদ মেলে। মন মেলে না। এ বয়সে বিগ্রহ দর্শন করতে এসেছি। দর্শনই মিলল, তার বেশী কিছু না।

তবুও তিনি কিছু বলতে পারেন নি তাঁকে। তারপর বলেছিলেন—আমি খুঁজছি একজনকে।

—মানুষ?

—হ্যাঁ।

—নারী?

—হ্যাঁ।

—তোমার স্ত্রী?

—হ্যাঁ।

—হারিয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

সরস্বতী বাঈ বলেছিলেন—পুত্র, ঈশ্বর হলে বলতাম হয়তো পেতে পার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বলছি আর তো পাবে না তাঁকে।

—পাব না?

—না। সে যুবতী। দেশ অরাজক। অরাজক বলেই বা কেন, পুরুষদের মধ্যে লম্পট কামুক বেশী। নরখাদকের চেয়েও তারা হিংস্র। হারিয়ে গিয়ে থাকলে পাবে না। নিজের কথা মনে পড়ছে। বললাম না আমার রূপ ছিল কণ্ঠ ছিল। ফলে—

—তারও আছে।

—তবে আর কি! সে হয় মরেছে নয় হাটে-বাজারে বিক্রী হয়ে গেছে। খুঁজতে খুঁজতে দেখা হয় তো পাবে কিন্তু সেও তোমাকে চিনবে না, তুমিও চিনতে পারবে না, চিনতে পারলে আত্মহত্যা করবে।

রঙ্গনাথন উন্মাদের মত উঠে চলে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আম্মা তাঁর হাত ধরে বলেছিলেন—আমি আম্মা, পুত্র। যেও না, আমার কথা শোন। তোমার এমন কণ্ঠ, এমন গান। বস। পথে মরলে বড় কষ্ট পাবো। বস। গান গাও। শোনাও আমাকে কিছু।

—পারব না। মার্জনা করুন।

বৃদ্ধা বলেছিলেন—তাহলে আমিই গাই শোন। বলেই তাঁর বীণা নিয়ে বসেছিলেন। গেয়েছিলেন রঙ্গনাথস্বামীর স্তোত্র।

পদ্মাধিরাজে-গরুড়াধিরাজে বিরিঞ্চিরাজে গুররাজরাজে
ত্রৈলোক্যরাজেঽখিললোকরাজে শ্রীরঙ্গরাজেরমতাং মনোমে।
লক্ষ্মী নিবাসে জগতাং নিবাসে-উৎপন্ন বাসে রবিবিম্ববাসে—
ক্ষীরাব্ধিবাসে ফণিভোগবাসে শ্রীরঙ্গবাসেরমতাং মনোমে!

শান্ত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন শ্রীরঙ্গনাথন। আম্মা বলেছিলেন—কিছুদিন আমার কাছে থাক। সুস্থ হও। তুমি অসুস্থ।

তাই ছিলেন তিনি। তাঁর পরমার্শেই তিনি পালাগান ফেলে দক্ষিণী মার্গসংগীত নতুন

করে চর্চা করেছিলেন। মাস চারেক পর। তখন তাঁরা পণ্ডিচেরীতে। গোলযোগ তখন ঘনিয়ে উঠছে দক্ষিণ পথের উত্তর অংশে। দক্ষিণ পর্যন্ত তার ঢেউ এসেছে। ভোঁসলে সিন্ধিয়া হোলকার একসঙ্গে মিলে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দক্ষিণমুখে আসছে। সরস্বতী বাঈ শেষ মহীশূর যুদ্ধে শ্রীরঙ্গপত্তনে ছিলেন। সে রক্তপাত লুঠতরাজের স্মৃতি তাঁকে বিহ্বল করেছিল। বলেছিলেন, পুত্র, মানুষ যখন যুদ্ধ করতে নামে তখন রাক্ষস হয়ে যায়। আমি জানি। চল। পণ্ডিচেরী ফরাসী এলাকা; সেখানে চল।

পণ্ডিচেরীতে এসে আম্মা সরস্বতী বাঈয়ের কাছে কয়েক মাস ছিলেন। তাঁর কাছে নতুন করে চর্চা করেছিলেন মার্গসঙ্গীতের। মন তাঁর ধীরে ধীরে অনেক সুস্থ হয়ে এসেছিল।

পণ্ডিচেরীতে কয়েকটা মজলিসে গান গেয়ে খ্যাতিও অর্জন করেছিলেন। হঠাৎ এরই মধ্যে মনে পড়েছিল লল্লাকে। লল্লা যদি মান্দ্রাজে এর মধ্যে ফিরে এসে থাকে! কয়েক দিনের মধ্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। একদিন বলেছিলেন সরস্বতী বাঈকে—আমাকে যেতেই হবে আম্মা। আমাকে যেতেই হবে। আমার মন বলছে—সে এতদিনে মান্দ্রাজ ফিরেছে।

আম্মা বাধা দেন নি। পণ্ডিচেরী থেকে একদিন আম্মা-সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে মান্দ্রাজে ফিরেছিলেন। স্থলপথে নয়, সমুদ্রপথে বড় মালবাহী নৌকোয়। আম্মা তাঁকে অর্থ দিয়েছিলেন, আর একটি বীণা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—পুত্র, মনকে বাঁধো। তাকে আর পাবে না। এই দুনিয়ায় হারানোই নিয়ম। মানুষ হারাতেই আসে। বেঁচেও যদি থাকে তবুও ঠিক সেই তাকে আর পাবে না।

একটু চুপ করে থেকে বলেছিলেন—খুঁজতে বারণ করবার অধিকার আমার নেই। নিজে এই বৃদ্ধ বয়সে ওই ছাড়া তো বাঁচবার পথ দেখি না। তবুও বারণ করছি। তোমার মূলধন আছে। ওই ভাঙিয়ে যদি চিরকাল রাখতে পার তবে যে সুখ পাবে সে চোখের জলের সুখ।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—তার থেকে তুমি ঈশ্বরকে খুঁজো। না পেলেও দুনিয়া তেতো হবে না। তাঁকে শুধু জীবনেই মেলে না, মরণেও মেলে। কিন্তু—

তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন।

তারপর বলেছিলেন—কিন্তু—। তুমি কি এখানেই থাকতে পার না পুত্র? শবরীকে তুমি পত্নী হিসাবে গ্রহণ করতে চাও—তুমি কি আমাকে জননী হিসাবে গ্রহণ করে আমার কাছে থাকতে পার না? তোমাকে সম্পদের লোভ দেখাব না। কিন্তু সঙ্গীত, সে তো দেবদুর্লভ সম্পদ। তাই দেব আমি তোমাকে।

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—আম্মা, ভেবে দেখুন—রামচন্দ্র বনবাসে এসেছিলেন—এসে সীতাকে হারিয়েছিলেন। বনবাস-অন্তে সীতা উদ্ধার করে ফিরেছিলেন। সীতাকে না নিয়ে তিনি কি কৌশল্যা মাতার কাছে ফিরতে পারতেন? ফিরলে কৌশল্যা মাতাও কি তাঁকে ফিরিয়ে দিতেন না, বলতেন না, সীতাকে নিয়ে তবে তুমি ফিরে এস?

সরস্বতী বাঈ বলেছিলেন—ঠিক বলেছ পুত্র। আমিও তোমাকে তাই বলছি—তুমি যাও। লল্লাকে নিয়ে তবে তুমি ফিরে এস। আর না পেলেও যেন এস।

রঙ্গনাথন প্রথমেই ফিরেছিলেন মান্দ্রাজ। প্রথম দেখা হয়েছিল যোশেফের সঙ্গে।

যোশেফ প্রশ্ন করেছিল—তুমি কোথায় গিয়েছিলে আচার্য?

—তারই সন্ধানে।

—লল্লার?

—হ্যাঁ যোশেফ। আমি তোমার কাছে সত্য বলব। তাকে আমি বরদরাজের নাম নিয়ে

সমুদ্র সাক্ষী করে বিবাহ করেছিলাম। সেইদিন রাত্রে যে দিন—। সংক্ষেপে সবই বলেছিলেন তিনি যোশেফকে। বলেছিলেন—আমার অপরাধ। আমার অপরাধে—। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি।

যোশেফ সবিস্ময়ে বলেছিল—তুমি শবর হয়েছ রঙ্গনাথন?

রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না, যোশেফ, লল্লাকে ব্রাহ্মণী করব বলে গ্রহণ করেছিলাম।

যোশেফ আক্ষেপ করে বলেছিল—হতভাগিনী, সে হতভাগিনী। নির্বোধ। সে আমার কাছে এল না কেন? একটু পরে সে প্রশ্ন করেছিল—কিন্তু তুমি এখন কি করবে রঙ্গনাথন?

—ঠিক তো জানি না।

যোশেফ সাগ্রহে বলেছিল—একটা কথা বলব আচার্য?

—বল।

—তুমি খৃষ্টান হবে? তোমার সঙ্গে আমি খুব সুন্দরী খৃষ্টান কন্যার বিবাহ দেব। যারা ব্রাহ্মণ থেকে খৃষ্টান হয়েছে তাদের কন্যা। পাদরীরা আমার কথা শুনবে।

হেসে রঙ্গনাথন বলেছিলেন—না যোশেফ। লল্লা—লল্লা ছাড়া আর কারুর আমার জীবনে স্থান নেই। সে হয় না যোশেফ।

যোশেফ একটু চুপ করে থেকেছিল, তারপর বলেছিল—তা হলে তুমি আর মাদ্রাজে থেকো না রঙ্গনাথান। এ কথা প্রকাশ হলে—

—তাতে তো আমি লজ্জিত হব না যোশেফ। পতিত তো আমি হয়েই আছি।

লজ্জিত তিনি সত্যই হন নি। মাদ্রাজকে তিনি জয় করেছিলেন গানে। পালাগান গান নি। মার্গসঙ্গীত গেয়ে তিনি নতুন করে মানুষকে জয় করেছিলেন। মন্দিরে নয়—সঙ্গীত-বিলাসী মানুষদের নিমন্ত্রণে শুধু মানুষের আসরে। তাঁর অপূর্ব সঙ্গীতের জন্য তাঁর পাতিত্যকে মানুষের হৃদয় আর প্রশ্রয় দেয় নি। লোকে বলেছিল, রঙ্গনাথন পাগল হয়ে সিদ্ধিলাভ করেছে গানে।

আচার্য চিদম্বরম বলেছিলেন—তুমি একটা প্রায়শ্চিত্ত কর রঙ্গনাথন।

রঙ্গনাথন হেসে বলেছিলেন—মার্জনা করবেন আচার্য!

* *

সমাজ থেকে দূরে তিনি সেই সমুদ্রতটে আপনার ঘরে বাস করতে লাগলেন। কাটাবেন লল্লার তপস্যায়। লল্লার স্মৃতি তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। নিশীথ রাত্রে পূর্ণিমার দিন—সমুদ্রে যখন জোয়ারের ডাক উঠত তখন অকস্মাৎ তাঁর মনে হত সমুদ্রতটে নারিকেল বনের বাতাসে যেন একটি নারী-কণ্ঠের আকুল ডাক ভেসে আসছে।

—প্রভু! প্রভু! বরদরাজ! লল্লার বরদরাজ!

তিনি উৎকর্ণ হয়ে শুনতেন।

নিরবচ্ছিন্ন আহ্বান ভেসেই আসত—ভেসেই আসত।

রঙ্গনাথন উদ্‌ভ্রান্তের মত বেরিয়ে পড়তেন ঘর থেকে। সমুদ্রতটের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করতেন। উঁচু বালিয়াড়ি পার হয়ে নিচে নামতেন সমুদ্রতটে। সেই নারিকেল বৃক্ষশ্রেণীর দীর্ঘ ছায়া আর পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার দুগ্ধধবল আলোয় চিত্রিত-বিচিত্রিত বালুবেলার উপর তিনি ঘুরে বেড়াতেন। চীৎকার করে ডাকতেন—লল্লা—লল্লা—। আমার জীবনলক্ষ্মী! কোথায় তুমি?

সমুদ্রবক্ষে সমুদ্রবিহঙ্গের দল—রাত্রেও তাদের বিশ্রাম নেই—তারা জ্যোৎস্নার মধ্যে কলরব

করে উড়ে বেড়াত।

কতদিন সেই নারিকেল বৃক্ষজোড়ার তলায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। ভোররাত্রে ঘুম ভাঙত; পাশের দিকে তাকাতেন—। লল্লা নেই। চুপ করে তিনি কিছুক্ষণ বসে থেকে তারপর উঠতেন। বাড়ি ফিরতেন। এসে পূজার ঘরে বসতেন; কাঁদতেন।

পূজার ঘরটিতে সবই আছে, নেই কোন মূর্তি। সেই যে বরদরাজের মূর্তিটি চুরি গেছে, স্থানটি শূন্য হয়েছে, সে স্থান তিনি আর পূরণ করেন নি।

এক-একদিন সকালে ঘুম ভেঙে উঠেও তাঁর ভ্রম দূর হত না। তিনি সেই সেদিনের মতই ভাবতেন—লল্লা তাঁকে না পেয়ে চলে গেছে। তিনি সমুদ্রতট ধরে হাঁটতে শুরু করতেন যোশেফদের পল্লীর দিকে।

যোশেফদের পল্লীর ছেলেমেয়েরা তাকে দেখে হাসত। ব্যঙ্গের হাসি। বলত—কি আচার্য? লল্লাকে চাই?

—লল্লা? কোথায় সে? কোথায়?

—আছে। কাল সে ফিরেছে গো।

—ডাক। তাকে ডাক। আঃ!

—কিন্তু সে তো আসবে না!

—কেন?

—সে খৃষ্টান হয়েছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ত্রাণকর্তার শরণ নিয়েছে। তুমি যদি খৃষ্টান হও তবে সে তোমাকে দেখা দিতে পারে।

ধীরে ধীরে তাঁর স্বাভাবিক চেতনা ফিরত। তিনি বুঝতে পারতেন—এরা তাঁকে ঠাট্টা করছে। বিষণ্ণচিত্তে তিনি ফিরে আসতেন।

মধ্যে মধ্যে যোশেফের সঙ্গে দেখা হলে সে তাঁকে সম্ভ্রম করে অভিবাদন করে বলত—আচার্য, আবার তুমি রাত্রে বেরিয়েছিলে? পূর্ণিমার ভ্রমে পেয়েছিল তোমাকে!

রঙ্গনাথন বলতেন—হ্যাঁ যোশেফ। কাল রাত্রে ঘুমের ঘোরের মধ্যে অকস্মাৎ যেন লল্লার ডাক শুনতে পেলাম। বার বার শুনেছি। ভ্রম তো ঠিক নয়।

যোশেফ গায়ে ক্রুশ এঁকে বলত—মেরী তোমাকে রক্ষা করুন আচার্য। প্রভু তোমাকে দয়া করুন। ভ্রম হয়তো নয়, এ সত্যই হয়তো বটে। লল্লা মরেছে তাহলে, তার প্রেতাত্মা তোমাকে ডাকে। ডেকে নিয়ে যায় সমুদ্রকূলে। তার কামনা সে তোমাকে ওই সমুদ্রে ফেলে তোমাকে আত্মহত্যা করাবে। তারপর তোমার আত্মাকে তার সঙ্গী করবে।

চুপ করে থাকতেন রঙ্গনাথন। ভাবতেন—তাই কি? মন বলত—না।—লল্লা যদি মরেই থাকে তবু সে তাকে কখনও আত্মহত্যায় প্রলুব্ধ করবে না। না। তা সে কখনও করতে পারে না। তার তো কামনা ছিল না। ছিল প্রেম—শুধু প্রেম—সে তো লীলাময়ী নয়—তাই তার নাম লল্লার বদলে কলাবিন্তী থেকে কল্যাণী করে দিয়েছিলেন। তার শ্যামবর্ণ মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

মাস কয়েক পর এই ভ্রান্তিটা যেন তাঁর কমে আসতে আসতে ঘুচে গেল। কিন্তু রঙ্গনাথন তাতে তৃপ্তি পেলেন না। মনে হল সব যেন শূন্য হয়ে গেছে। এই ভ্রান্তির মধ্যে তিনি যেন লল্লাকে হারিয়েও লল্লার সঙ্গে বাস করেছিলেন।

কতদিন রাত্রে এই ভ্রমের বশে কত নারিকেল ছায়ার মধ্যে শীর্ণ একটি জ্যোৎস্নার ফালিকে লল্লা বলে মনে করে ছুটে গেছেন; সেখানে তাকে পান নি—তবু ভ্রম ভাঙে নি, মনে হয়েছে

লল্লা। কৌতুকভরে বা অভিমানবশে এখান থেকে সরে গিয়ে গাঢ় ছায়ার মধ্যে লুকিয়েছে—তিনি খুঁজেছেন। খুঁজে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে সেই জোড়া নারিকেল বৃক্ষের তলদেশে শুয়েছেন; ভেবেছেন—সে একসময় এসে তাঁর পাশে বসে তাঁকে মৃদুস্বরে ডাকবে, প্রভু, আমি এসেছি। আমার বরদরাজ, আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গেছেন। স্বপ্নঘোরে মনে হয়েছে লল্লা তাঁর পাশে শুয়ে আছে। হাত দিয়ে তিনি নারিকেল বৃক্ষের গোড়াটি জড়িয়ে ধরেছেন। ঘুম ভেঙে গেছে।

সে যেন মিথ্যার মধ্যেও তিনি বিরহ-মিলনের পরম-আনন্দের সত্যলোকে বাস করেছেন। সেই বাস্তবে আনন্দলোক ক্রমে ক্রমে পরমসত্য কোথায় যেন মিলিয়ে গেল!

তিনি অনেক ভেবে স্থির করলেন—আবার তিনি দেবতা মন্দিরের বাইরে বসে দেবতাকে গান শোনাবেন।

সেদিন তিনি মান্দ্রাজ ছেড়ে আবার গেলেন কাঞ্জীভরমে বরদরাজের মন্দিরের সম্মুখে। মন্দির-চত্বরের বাইরে একটি গাছতলায় বসে তিনি বীণা নিয়ে ভজন শুরু করলেন।—

মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং
মধু তোঽপি মধুরং মধুরং মধুরং।
মধুরং বদনং মধুরং বচনং
মধুরং মধুরং কলেবরং।
মধুরমধীরম নিক্কতি মধুবং
মধুতোঽপি মধুরং পীতাম্বরং
মধুরং চরণং চরণাভরণং
মধুরস্বরঃ স্থিত রত্নং।
মধুর স্মিতমেতদহো
প্রেক্ষণম তনু মনোহরং।

আপনমনে তিনি গেয়ে চলেছেন। কোনদিকে দৃষ্টি তাঁর ছিল না। আত্মমগ্ন হয়ে গাইছিলেন। হঠাৎ মন্দিরচত্বরের মধ্য থেকে কাঁসরঘণ্টা শিঙা এবং দামামা বাজিয়ে একদল লোক এসে তাঁকে ঘিরে দাঁড়াল। তখন দেখলেন অনেক লোক তার চারিপাশে জমে গেছে, তাদেরও ওপাশে মন্দিরের সিংহদ্বার থেকে বেরিয়ে একদল লোক এসে উচ্চরোলে বাজনা বাজাচ্ছে, যার মধ্যে নিজের কণ্ঠস্বর তিনি নিজেই শুনতে পাচ্ছেন না। মধ্যপথেই গান বন্ধ করলেন তিনি। বুঝলেন পুরোহিতেরা তাঁকে ক্ষমা করেন নি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন।

—নাঃ। দেবমন্দির থেকে তিনি নির্বাসিত হয়েছেন। দেবমন্দিরে দেবতা কেউ নন। পুরোহিতেরাই সব। ভুল হয়েছিল তাঁর। ভুল হয়েছিল।

সেখান থেকে উঠে কাঞ্চীপুরমের প্রান্তদেশে এসে রাত্রিটা কাটিয়ে দিলেন উন্মুক্ত আকাশের তলায়। আশ্রয় কারুর কাছে নেবেন না তিনি। তিনি পথিক। সন্ধানে চলেছেন—লল্লার সন্ধানে। পথই তাঁর আশ্রয়।

ঘুম তাঁর আসে নি। ক্ষুধা পেয়েছিল। দুরন্ত ক্ষুধা। ক্ষুৎকাতর অবস্থায় জেগে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলেন। অকস্মাৎ কিছু দূরে মানুষের সাড়া পেয়ে তিনি একটু শঙ্কিত না হয়ে পারেন নি। মনে পড়েছিল এই বরদরাজের মন্দিরে তাঁর সেই প্রথম পালাগানের কথা। পালাগান সেরে সমুদ্রতটে নৌকা ধরবার জন্য যখন আসছিলেন তখন তাঁকে অজ্ঞাত আততায়ীরা

মাথায় আঘাত হেনেছিল। প্রশ্ন করেছিল, এই গান রচনা করতে কে শেখালে তোমাকে?

আবার আজও কি তারই পুনরাবৃত্তি ঘটবে? সেদিন যারা আঘাত করেছিল, তাদের তিনি চিনেছিলেন। তারা যোশেফের দল। তারা খৃষ্টান হয়ে আজ নতুন শিক্ষা পেয়েছে, উন্নত হয়েছে, তারা আজ শবরদের সমাজে পতিত বললে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনি তাদের প্রতি উচ্চবর্ণের অন্যায় অত্যাচারের বেদনায় তাদেরই জয়ধ্বনি তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা বোঝে নি। আঘাত করেছিল।

আর আজ নিঃসন্দেহে যারা আসছে, তারা ঐ পুরোহিতের দল। তারা তাঁকে ক্ষমা করে নি। তিনি ব্রাহ্মণ হয়ে শবরকন্যাকে ভালবেসেছেন, তাকে বরদরাজের মূর্তিটি দিতে বলেছিলেন যোশেফকে, সে কথা শুনে অবধি তাঁর প্রতি তাদের মর্মান্তিক ক্রোধ। তিনি ফিরে এসে মার্গ-সঙ্গীতে সাধারণ মানুষের চিত্ত জয় করেছেন, সম্মান পেয়েছেন, সম্পদও পেয়েছেন, পেয়ে পেয়ে ভেবেছিলেন তিনি পুরোহিতদের চিত্তও জয় করেছেন। কিন্তু না। এদের জয় তিনি করতে পারেন নি। তারা তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছিল—তাও তিনি করেন নি। তাতে ওদের আক্রোশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আজ বরদরাজের মন্দির-সীমানার বাইরে বসে গান করাটাকে তারা চরম স্পর্ধা ধরে নিয়ে তাকে নিষ্ঠুর আঘাত করতে আসছে। তিনি স্থির হয়ে বসলেন। আসুক, যা আসবে আসুক।

লোক কটি কিছু দূরে এসে দাঁড়াল।

তিনি প্রশ্ন করলেন—কে? কারা তোমরা?

—আপনি আচার্য রঙ্গনাথন?

হেসে রঙ্গনাথন বললেন—আচার্য কি না জানি না। তবে আমি রঙ্গনাথন।

—আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বিস্ময়ে চমকে উঠলেন রঙ্গনাথন। এ যে নারীকণ্ঠ!

সর্বাঙ্গ আচ্ছাদনে আবৃত করে একটি বালকমূর্তির মত কেউ তাঁর দিকে এগিয়ে এল। এসে তাঁর সামনে বালুর উপর হাঁটু গেড়ে বসল। নিজের অঙ্গের আচ্ছাদন সে খুলে ফেলে বললে—প্রণাম আচার্য।

সেদিন পূর্ণিমা ছিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় প্রান্তর ঝলমল করছিল। সেই জ্যোৎস্নায় অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন রঙ্গনাথন। কি রূপ! এ কৃষ্ণাঙ্গী নয়, গৌরী—অপরূপ লাবণ্যবতী পূর্ণযৌবনা একটি মেয়ে।

রঙ্গনাথন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে?

মেয়েটি বললে—আমি সামান্যা। আমার নাম 'হেমাম্বা'।

—হেমাম্বা! বিস্ময়ের আর অবধি রইল না রঙ্গনাথনের। দেবদাসীশ্রেষ্ঠা হেমাম্বা! অনেককাল আগে তাকে দেখেছেন রঙ্গনাথন। সে দেখেছেন আলোকমালায় উজ্জ্বল নাটমন্দিরের মধ্যে, নর্তকীর বেশে। অপূর্ব প্রসাধনে প্রসাধিতা, পুষ্পমাল্যে অলঙ্কারে সজ্জিতা। আর এ মেয়ের অঙ্গে সে-সবের চিহ্ন নেই। কিন্তু তার থেকেও অনেক শ্রীমতী মনে হচ্ছে। তার উপর এই ভুবনভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার আলোয় সূর্যের দীপ্তি নেই, উত্তাপ নেই, কিন্তু একটি আশ্চর্য রহস্য আছে। রূপকে সে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বিশ্লেষিত করে না, একটি কুহেলী রহস্যে রহস্যময়তায় অপরূপা করে তোলে। শুভ্র সৌন্দর্যের একটি বিলেপনের প্রসাধন বুলিয়ে দেয়। মনের মধ্যে তাঁর গুঞ্জন করে উঠল—

"স্বর্ণ-কমলবর্ণাভাং সুকোমলাং সুলোচনাং শুভ্রজ্যোৎস্নাবিলেপিতাং অপরূপাং মনোরমাং—।"

সলজ্জ হেসে হেমাম্বা বললে—আচার্য, আপনাকে আমি আহ্বান করতে এসেছি আমার গৃহে। যখন পুরোহিতেরা দামামা নাকাড়া শিঙা বাজিয়ে আপনাকে গানে বাধা দিয়ে স্তব্ধ করে দেয়, তখন আমি নিজেকে আচ্ছাদনে আবৃত করে ওই জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনার গান শুনছিলাম। চোখ থেকে আমার জল পড়েছিল। আপনি গান বন্ধ করলেন। তারপর উঠে নগরের পথ ধরে চলে গেলেন, আমি অনেক দুঃখ পেলাম। কাঞ্জীভরমে আপনি কোথায় যাবেন, কোথায় স্থান পাবেন তা বুঝতে পারলাম না। একটি অনুগত লোককে আপনার পিছনে পিছনে পাঠিয়েছিলাম আপনি কোথায় যান তাই দেখতে। সে গিয়ে বললে, আপনি নগর পার হয়ে এই বালুপ্রান্তরে এসে উত্তরীয় পেতে শুয়েছেন তার উপর। অভুক্ত। কারণ সে আপনাকে কোথাও খেতে দেখে নি। তাই আমি এসেছি আচার্য। কিঞ্চিৎ আহার্য নিয়ে এসেছি, দয়া করে গ্রহণ করুন, আর দয়া করে আমার গৃহে আসুন, রাত্রির মত অবস্থান করবেন।

অবাক হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন।

বললেন—দাও, আহার্য দাও। সত্যই বড় ক্ষুধা পেয়েছিল আমার। কিন্তু তোমার ঘরে আমি যাব না দেবদাসীশ্রেষ্ঠা, তাতে তোমার বিপদ হবে।

হেমাম্বা বললে—আর আমি দেবদাসী নই আচার্য। বোধ হয় আপনি জানেন না। একদিন রাত্রে মন্দির থেকে বেরিয়ে যাবার পথে আমি অপহৃতা হয়েছিলাম। ফিরিঙ্গী পল্টনের কজন গোরা আমাকে ধরে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সকালে আমি অচেতন হয়ে পড়ে ছিলাম নগর থেকে ক্রোশখানেক দূরে। তারপর থেকে আর আমি দেবদাসী নই। এখন আমি গণিকা।

মাথা হেঁট করে বসে রইল হেমাম্বা।

রঙ্গনাথন বললেন—দাও, আমাকে আগে খেতে দাও। বলে হাত পাতলেন তিনি। আহার করে জলপান করে বললেন—আঃ! প্রাণ আহার নইলে বাঁচে না। তুমি আমাকে আহার দিলে না—প্রাণ দিলে!

হেমাম্বা বললে—এবার আমার ঘরে চলুন। আমি জানি শ্রীরঙ্গমে আপনি আম্মা সরস্বতী বাঈএর ঘরে অনেক দিন ছিলেন। আম্মা আপনাকে মায়ের মতই স্নেহ করতেন।

কণ্ঠস্বর মৃদু করে সে বললে—আজীবন আপনার কৃতদাসী হয়ে থাকব আচার্য। আপনি এক শবরীকে ভালবেসে তাকে হারিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত হয়ে গেছেন। গৃহহীন বৈরাগী আপনি। আমি শবরীর চেয়ে বেশী ভালবাসতে জানি প্রভু। আমি শুধু একদিনের জন্য নয়, চিরদিনের জন্য আপনাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। আমার অর্থ আছে প্রভু। আমি আপনাকে নিয়ে শ্রীরঙ্গম ত্যাগ করে চলে যাব। মান্দ্রাজে আপনার লজ্জা হবে হয় তো। মান্দ্রাজ নয়, চলে যাব পণ্ডিচেরীতে, নয় তো কলকাতায়। যেখানে বলবেন আপনি।

স্তব্ধ নিস্পন্দ মাটির মূর্তির মত বসে রইলেন রঙ্গনাথন।

—আচার্য!

—দেবী!

—দেবী নয়, আমি হেমাম্বা—আপনার দাসী।

—অমৃতের মত বাক্য তোমার মধুর থেকেও মধুর। কিন্তু তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

একটু চুপ করে থেকে হেমাম্বা বললে—একটা প্রশ্ন করব আচার্য?

—বল।

—কৃষ্ণাঙ্গী লল্লা এর, অর্থাৎ যে সব গুণ-রূপের কথা বললেন, তার থেকেও অধিকতর রূপ-গুণের অধিকারিণী ?

—তা আমি বলছি না, দেবী !

—তবে ?

—একদিন সমুদ্রতটে, আজকের মতই এক পূর্ণিমা রাত্রে সে আমাকে বলেছিল, আপনি আমার বরদরাজ। আমি তাকে বলেছিলাম, আমি যদি তোমার বরদরাজ হই লল্লা, তবে তুমি আমার লক্ষ্মী। অথবা গোদাদেবী, যিনি লক্ষ্মী হয়েও অনার্য গৃহে জন্ম নিয়ে নিজ তপস্যায় নারায়ণের পাশে নিজ অধিকার অর্জন করে আজও প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

—কিন্তু সে তো হারিয়ে গেছে আচার্য।

"—মনে সে অক্ষয় হয়ে আছে হেমাম্বা। নইলে তোমার নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করতাম না। মাথায় করে নিতাম। সে আমার কাছে বরদরাজের নির্মাল্য, আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।" তুমি আমাকে মার্জনা কর।

হেমাম্বা কয়েক মুহূর্ত নতমস্তকে চুপ করে রইল, তারপর প্রণাম করে উঠে ভোজনপাত্রটি হাতে করে চলে গেল। রঙ্গনাথন দেখলেন, জ্যোৎস্নার আলোয় তার গালের উপর দুটি রেখা চকচক করছে। কাঁদছিল হেমাম্বা।

সেদিন তিনিও কেঁদেছিলেন, তবে তারপরে—

পরদিন ভোরবেলা যাত্রা করে মান্দ্রাজ এসে পৌঁছেছিলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কাঞ্চীভরম থেকে এল বিচিত্র সংবাদ, মান্দ্রাজের উচ্চবর্ণের সমাজে এ নিয়ে পরিহাস ও ব্যঙ্গের আর অবধি রইল না।

ম্লেচ্ছ উচ্ছিষ্টা দেবদাসী হেমাম্বার ঘরে অন্নজল গ্রহণ করেছেন রঙ্গনাথন। রঙ্গনাথনের উপাধি রটে গেল "হেমাম্বার জার" "শবরীর অধরপিয়াসী"।

মান্দ্রাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মজলিসে মার্গসঙ্গীতের আসরে তিনি গান ধরলেই কোথাও থেকে কেউ বলে উঠত—"জয় লল্লা"। গান শেষ হলে ধ্বনি উঠত, "জয় হেমাম্বা"।

তিক্ত হয়ে একদিন রঙ্গনাথন অনেক তদ্বির করে ইংরেজদের জাহাজে স্থান সংগ্রহ করে চড়ে বসলেন। যাবেন কলকাতা। কলকাতা থেকে উত্তর ভারত ঘুরবেন।

* * * *

উত্তর ভারতের তীর্থে তীর্থে। বারাণসী প্রয়াগ অযোধ্যা বৃন্দাবন পর্যন্ত গিয়ে আর যেতে পারলেন না। সমগ্র উত্তর ভারত তখন একটা যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অযোধ্যার নবাবের রাজ্যে কিছু শান্তি। বৃন্দাবনে কিছুদিন থাকলেন। রাধা আর কিষণজী। কিষণজীর থেকেও রাধা প্রধান। রাধারাণীর রাজ্য। জগতের পতি, পুণ্যাবতার কিষণজী তাঁর অধীন। পায়ে ধরে মান-ভঞ্জন করেছিলেন। তারপর চলে গিয়েছিলেন। সারা জীবন কেঁদেছিলেন রাধা।

কুঞ্জে কুঞ্জে ঘুরে বেড়াতেন, কান পেতে শুনতেন সে ক্রন্দন শোনা যায় কিনা। তার মধ্যে মিল পেতেন নিজের জীবনে। লল্লার ক্রন্দন আর রাধার ক্রন্দনে তফাৎ ছিল না তাঁর কাছে।

বিচিত্র মানুষের মন। আবার একদিন উতলা হয়ে উঠল। মনে হল দক্ষিণের কথা। মান্দ্রাজ! লল্লা যদি ফিরে এসে থাকে! মনে মনে নানান কাহিনী রচনা করেন। লল্লা পথভ্রান্ত হয়ে গিয়ে পড়েছিল কোন স্থানে হয়তো। মারাঠাদের এলাকায় কিম্বা নিজামের

এলাকায়—যেখানে লড়াই চলছেই চলছেই। সর্বত্র আছে ইংরেজ ফিরিঙ্গী। তারা হয়তো তাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। অথবা নির্মম অত্যাচার করেছিল। মনে পড়েছিল মাল্যবান পর্বত যাবার সময়কার সেই আশ্রয়স্থল শবরপল্লী। সেই "উন্নি" মেয়েটি। ওদের গোষ্ঠীপতির কন্যা। অত্যাচারে পাগল হয়ে গিয়েছিল। দিনরাত্রি চীৎকার করত—'না-না-না ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে। মেরে ফেল। মেরে ফেল আমাকে। মেরে ফেল।' সেই 'উন্নি'র মতই হয়তো পাগল হয়ে পথে পথে ফিরে আবার ক্রমে সুস্থ হয়েছে এতদিনে। সুস্থ হয়ে মান্দ্রাজ ফিরে এসেছে। যোশেফ তাকে নিশ্চয় সব বলেছে। হয়তো বা যোশেফদের পল্লীতেই তাঁর পথ চেয়ে সে বসে আছে।

ভাবতে ভাবতে মনে বিশ্বাসটা দৃঢ় হয়ে ওঠে। শেষে একদিন স্বপ্ন দেখলেন। পরদিন তিনি আবার ওঠেন। চল মান্দ্রাজ। আবার মান্দ্রাজ ফিরে যাবেন। বৃন্দাবন থেকে শহরে শহরে বড় বড় মজলিসে গান শুনিয়ে উপার্জন করে, কোথাও নৌকায়, কোথাও উটের গাড়িতে, কোথাও পদব্রজে ঘুরে কলকাতা এসে পৌছুলেন। এবার ফিরিঙ্গী কোম্পানীর জাহাজে স্থান সংগ্রহ করবেন। মান্দ্রাজ যাবেন। মান্দ্রাজে নেমেই নিশ্চয় যোশেফদের পল্লীর কারুর সঙ্গে দেখা হবেই। তারা নৌকায় কাজ করে।

জাহাজে একটু নিজের স্থানের জন্য গিয়ে কিন্তু যোশেফের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়ে গেল।

—যোশেফ!

যোশেফও কম আশ্চর্য হয় নি, সে বললে—আশ্চর্য!

—তুমি কি আমাকে খুঁজতে কলকাতায় এসেছ? লল্লা ফিরেছে?

যোশেফ হাসলে। অতি বিষণ্ণ সে হাসি। বললে—সে দুর্ভাগিনীকে এখনও তুমি ভুলতে পার নি, আচার্য?

—ভুলতে কি পারি যোশেফ! তাকে যে আমি সত্যই ভালবেসেছি। শুধু সমাজের ভয়ে কয়েক দণ্ড বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম। তার জন্য এতদিন দুঃখ পাচ্ছি। কিন্তু তার কত বড় দুঃখ, কত বড় দুর্দশা হয়েছে ভাব তো! ওঃ—।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যোশেফ বললে—না আচার্য, সে তো ফেরে নি।

—ফেরে নি! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন রঙ্গনাথন। এত বড় বিশ্বাস, তীর্থের স্বপ্ন সব মিথ্যা হয়ে গেল! সংসারে কি সবই মিথ্যা! সত্য কি কিছুই নেই! হে বরদরাজ! হে শ্রীরঙ্গনাথন প্রভু! হে একাম্বরেশ্বর! হে কন্যাকুমারী! তোমার অনাদিকালের মহেশ্বর কামনায় তপস্যা, তাও কি মিথ্যা?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই ফিরছিলেন রঙ্গনাথন। যোশেফ তাঁকে ধরে আটকালে।

—কোথায় যাবে?

—জানি না যোশেফ। যেমন পথে পথে ফিরছি, তেমনিই ফিরব। এখানে থাকি কিছুদিন। আবার উঠব।

—না। ফিরেই চল আচার্য। মান্দ্রাজ চল। তোমার অভাব আমরা অনুভব করি। আর মান্দ্রাজের লোক তোমার বিপক্ষে যাবে না। তুমি বারাণসীতে আর বৃন্দাবনে মন্দিরে গান করেছ, সেখানকার প্রশংসা লোকের মুখে মুখে মান্দ্রাজ পর্যন্ত পৌছেছে। চল, ফিরে চল।

শুনে ভাল লাগল রঙ্গনাথনের। সে অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বললে—সেই জন্যই এসেছিলাম এখানে। কোম্পানীর জাহাজে জায়গার জন্য। বৃন্দাবনে স্বপ্ন দেখেছিলাম যোশেফ, লল্লা মান্দ্রাজে তোমাদের পল্লীর সমুদ্রতটে আমার জন্যে বসে আছে। সেই বিশ্বাসে ফিরছিলাম

বড় আশা নিয়ে। আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, তবে তাই চল।

যোশেফ তার হাত চেপে ধরে বললে—আমি বড় নৌকা নিয়ে এসেছি ব্যবসায়ীদের মাল নিয়ে। এখন আমি নিজে মালের বড় নৌকা করেছি। এখানকার মাল নিয়ে আবার কালই রওনা হব। চল তুমি।

সেই নৌকোয় ফিরেছিলেন রঙ্গনাথন। নৌকো পথে মধ্যে মধ্যে কূলে ভিড়িয়ে বিশ্রাম করে। প্রয়োজন হয় পানীয় জলের। খাবার-দাবারেরও দরকার হয়। নৌকো সেই কারণেই ভিড়েছিল পুরীতে।

নীলমাধবের রাজধানী পুরী। সমুদ্র থেকে তার মন্দিরচূড়া দেখা যায়। হঠাৎ রঙ্গনাথনের চিত্ত আলোড়িত হয়ে উঠল।

মহাতীর্থ জগন্নাথধাম। আচণ্ডালের পরমতীর্থ! জগন্নাথ নীলমাধবের পরম প্রিয় এই শবরেরা। শবরেরাও তাঁর সেবক। সেবার অধিকারী। মহাপ্রসাদে জাতিভেদ নেই, স্পৃশ্যা-স্পৃশ্য নেই। সর্ব জাতির হাতের মহাপ্রসাদ অন্ন ফিরিয়ে দেবার হুকুম নেই এখানে। এখানে সব সমান, সব সমান। ভাবতে ভাবতে রঙ্গনাথনের চোখে জল এল। আপসোস হল, এতকাল সে এই মহাপ্রভু—মহান দেবতাটিকে গান শোনায় নি!

রঙ্গনাথন বীণা হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে—যোশেফ, আমি এখানে নামব। জগন্নাথকে আমার আজও গান শোনানো হয় নি। আমি নামব।

যোশেফ হেসে বললে—নামবে আচার্য? কিন্তু মান্দ্রাজ?

—যাব। যাব। পরে যাব। এখন আমাকে নামিয়ে দাও।

একখানা ছোট নৌকো ডাকলে যোশেফ। বললে—মান্দ্রাজকে ভুলো না।

* * * *

সেই অবধি রঙ্গনাথন এইখানে রয়ে গেছেন। বড় ভাল লেগেছে। বড় ভাল লেগেছে।

প্রথম যেদিন বীণা হাতে মন্দিরচত্বরে ঢুকে পাণ্ডাদের অনুমতি নিয়ে মহাপ্রভুকে গান শোনাতে বসলেন সেইদিন সেই গানই গেয়েছিলেন। যে গান গেয়ে তিনি তিরস্কৃত হয়েছিলেন কাঞ্জীভরমে—সেই গান—"কৃষ্ণবর্ণ চর্মের অন্তরালে যিনি বাস করেন, তিনিই বাস করেন বৈকুণ্ঠে। তিনিই বাস করেন শ্বেত পীত গৌর শ্যাম সকল-বর্ণ-চর্মাবৃত মানুষের দেহের মধ্যে। জীবের মধ্যে। যিনি বসবাস করেন বৈকুণ্ঠে, তিনিই বাস করেন ব্রাহ্মণপল্লীতে এবং শবর পল্লীতেও তিনিই বাস করেন। ওই কৃষ্ণচর্মের অন্তরালে যিনি, তিনিই কোথাও বরদরাজ, কোথাও জগন্নাথ, কোথাও শ্রীরঙ্গনাথন, কোথাও রামেশ্বরম, কাশীতে তিনিই বিশ্বনাথ। কৈলাসের ভবানীপতি যিনি, তিনিই কিরাতরূপী হয়ে অর্জুনের প্রণতি এবং পূজার মাল্য কণ্ঠে ধারণ করেছিলেন।"

জয়ধ্বনি উঠেছিল চারিদিকে—জয় জয় জগন্নাথ, জয় নীলমাধব! একদিনেই তিনি সকলের স্নেহ প্রশংসা দুই অর্জন করেছিলেন। চিত্ত তাঁর ভরে উঠেছিল। উঠে আসবার সময় প্রভুকে প্রণাম করে বলে এসেছিলেন, সান্ত্বনা তোমার কাছেই পাব। এখানেই রইলাম জীবনের বাকী দিনগুলি।

সেই অবধি এখানেই থেকে গেছেন। শবরপল্লীর পূর্বদিকে ঘন ঝাউবন, পশ্চিমে চক্রতীর্থের ধার থেকেও ঝাউবন, সম্মুখে বেলাভূমি সেখানে অশান্ত সমুদ্রকল্লোল, উত্তরে নীলমাধবের মন্দির। এরই মধ্যে বেছে বেছে শবরপল্লীর পূর্বদিকের ঝাউবনের মধ্যে তিনি একটি কুটির তৈরী

করালেন। মনোরম ছোট একটি কুটির। দক্ষিণমুখে একটি বারান্দা, পশ্চিমে একটি বারান্দা। সকালে উঠে পশ্চিমদিকের বারান্দায় বসে বীণায় ঝঙ্কার তুলে আলাপ করেন ভৈরবী। আবার সন্ধ্যায় চলে যান মন্দিরে, আরতি দর্শন শেষে প্রণাম করে চলে এসে দক্ষিণের বারান্দায় বসে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই সঙ্গীত আলাপ করেন। সম্মুখে সমুদ্রবক্ষে উদ্বেল তরঙ্গ-শীর্ষে বিচিত্র দীপমালা জ্বলে ওঠে মধ্যে মধ্যে। মনে মনে বলেন···এই ভাল, এই ভাল···

জপ কোটি গুণংধ্যানং ধ্যান কোটি গুণংলয়ঃ।
লয় কোটি গুণং গায়ং গানাৎ পরতরং নহি।

এর মধ্যেই জীবন তাঁর পূর্ণ হয়ে উঠুক।

মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ আসে। দেবদাসীদের নৃত্য দেখবার জন্য মন্দিরের পুরোহিত বলে পাঠান—আজ নাটমন্দিরে প্রভুর সম্মুখে এক দেবদাসী নৃত্য দেখাবার নিমন্ত্রণ করেছেন আচার্য। উপস্থিত থাকবেন আপনি।

বাকী সময়টা কাটে তাঁর ওই শবর বালক-বালিকাদের নিয়ে। কিন্তু তার মধ্যেও অকস্মাৎ লল্লা সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। মধ্যে মধ্যে এমনও হয় যে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে যান।

মনে হয় জগন্নাথদেবের মন্দিরের মধ্যে মণিবেদীর সম্মুখে দেবতাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে লল্লা। কখনও কখন দিনরাত্রি সব বিষণ্ণতায় ভয়ে যায়।

তখন চলে যান পুরী ছেড়ে। ভুবনেশ্বরের দিকে।

বিন্দু-সরোবর-প্রান্তে গিয়ে বসেন। সরোবরের মাঝে মন্দির। বৈশাখে চন্দনযাত্রায় ভগবান এসে ওই মন্দিরে বাস করেন। কখনও ঘোরেন মন্দিরে মন্দিরে। দেবাদিদেব মহাদেব এবং মহাদেবীর চত্বরে বসে গান শোনান।

কখনও মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ বনস্পতি-কাণ্ডে লীলায়িত দেহের ভার ন্যস্ত করে প্রতীক্ষমানা তরুণীকে দেখেন। তার মধ্যে লল্লার ছায়া দেখতে পান।

কখনও চলে যান খণ্ডগিরি উদয়গিরিতে। সেখানকার চারিদিকে গভীর বন জমে উঠেছে। বাঘের ভয় আছে। সাপের ভয় আছে। কিন্তু সে ভয় যেন তাঁর চলে গেছে। সেইখানেই কোন একটি গুহাতে বসে কাটিয়ে দেন দিন। অপরাহ্ণ হলে চলে আসেন। কিছুদিনের মধ্যে ভুবনেশ্বরেও ছোট একটি কুটির তৈরী করলেন।

পুরীধামে যাত্রীদের ভিড় হলে এখানে চলে আসেন। মানুষের ভিড় তাঁর সহ্য হয় না। শুধু ভাবতে ভাল লাগে।

আম্মা সরস্বতী বাঈ ঠিক বলেছিলেন—পুত্র, সব মিথ্যা। আমি জন্মেছিলাম উচ্চকুলে, রূপের জন্য কণ্ঠের জন্য ঘর-সংসার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে মানুষ আমাকে নর্তকী করে আমার যত অপমান করুক—আমাকে নিরাসক্তি একটি দিয়েছে। নিরাসক্ত হয়ে পৃথিবীকে দেখবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। দেখে বুঝেছি, মানুষ পৃথিবীতে নিতে আসে না—দিতে আসে, পেতে আসে না, হারাতে আসে। পাওয়াটা মিথ্যা, হারানোটাই সত্যি। সব হারিয়ে ফকির হয়ে পথে দাঁড়াতে অনেক দুঃখ পুত্র। তাই যে জীবনের প্রথম থেকে ফকির সে কিছু হারায় না। লল্লাকে তুমি পেয়েছিলে, লল্লা সত্যই তোমার কাছে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিল—তাই তাকে হারিয়েছ—এবং এত দুঃখ তোমার। ভুলতে হলে আর কাউকে পেতে হবে। তাই বলি ভগবানকে পেতে চেষ্টা কর। যাকে পেলে হারাতে হয় না।

লল্লা হারিয়ে গেছে। কিন্তু তাকে ভুলতে তিনি পারছেন না—পারবেন না। দেবতাকেও তিনি পেতে চাইতে গিয়েও যেন চাইতে পারছেন না। তাতে যে লল্লাকে হারানোর দুঃখ

হারিয়ে ফেলতে হবে।

লল্লা হারিয়েছে—কিন্তু তাকে হারানোর দুঃখ তিনি ভুলতে পারবেন না। কিছুতেই পারবেন না। তা হলে লল্লা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

* * * *

সেদিনও বীণায় হাত রেখে ঠিক এই কথাই ভাবছিলেন। ফাল্গুন মাস—পুরীতে ভগবানের দোলযাত্রার মহোৎসব। যাত্রীরা দলে দলে আসতে শুরু করেছে। ভিড় জমছে দিন-দিন। কোলাহল ছেড়ে পালিয়ে ভুবনেশ্বর-প্রান্তে নির্জনে তাঁর কুটিরটিতে এসে আশ্রয় নিয়েছেন রঙ্গনাথন।

আজ বসে আছেন বিন্দু সরোবরের ধারে। কোথায় পুষ্পিত হয়েছে চম্পকবৃক্ষ। মদির গন্ধ আসছে। কাছে একটি নিমগাছকে আচ্ছন্ন করে একটি মাধবীলতা পীতমর্ম শুভ্রবর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পস্তবকে যেন ভেঙে পড়তে চাইছে। বেলা প্রায় এক প্রহর। কোলের উপর বীণাটি রয়েছে, তাতে সুর বেঁধে তিনি তারে ঝঙ্কার দিয়ে সুর তুলছেন। কি বাজাচ্ছেন—সে সম্পর্কে খুব সচেতন নন। আঙুল তাঁর বাজিয়ে চলেছে অবচেতন মনের খেয়ালে। তিনি নিজে ভাবছেন সব মিথ্যা, এইটেই সব থেকে বড় সত্য।

পুষ্পস্তবক আচ্ছন্ন করে বন্য মধুমক্ষিকারা গুঞ্জন করছে। সে গুঞ্জনে প্রমত্ততা রয়েছে। বীণাতে তাঁর আঙুল ওই গুঞ্জন ঝঙ্কারকে তুলে চলেছে।

একটি কলরব এসে কানে পৌঁছল।

তিনি চোখ তুললেন। কলরবের ভাষা তাঁকে আকৃষ্ট করল। তামিল ভাষায় কথা বলছে। দক্ষিণের যাত্রী এই সময় আসে বেশী। এই ইংরেজ মারাঠা নিজাম পিণ্ডারীদের তাণ্ডবের মধ্যে স্থলপথ বিপদসঙ্কুল। সমুদ্রপথ আষাঢ় মাসে ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ। তাই নৌকো করে তারা এই বসন্তোৎসব দোলযাত্রার সময় বেশী আসে। তামিল-ভাষী যাত্রী। স্বাভাবিকভাবেই তিনি উৎসুক দৃষ্টিতে তাকালেন। একদল নারী-পুরুষ। সন্ন্যাসিনী একজন। অনাবৃত মস্তক, মাথার রুক্ষ কেশভার চূড়া করে বাঁধা। ও কে? গলায় তুলসীর মালা! ও কে?

মুহূর্তে পঙ্গু হয়ে গেলেন তিনি।

লল্লা! লল্লা সন্ন্যাসিনী! কণ্ঠে তার তাঁরই সেই তুলসীর মালা! গৈরিক-বাসা—শীর্ণা, তপস্বিনী। আয়ত দৃষ্টিতে বৈরাগ্য। সে লল্লায় এ লল্লায় অনেক প্রভেদ। তবুও সে লল্লা। লল্লাও তাঁকে দেখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। স্থির দৃষ্টিতে দেখছে। নিষ্পলক স্থির দৃষ্টি।

যাত্রীরা তাকে বলছে—কি হল? এস। কল্যাণী! কল্যাণী! লল্লা নিরুত্তর।

তিনি চীৎকার করে ডাকতে চাচ্ছেন, কিন্তু কণ্ঠ কি তাঁর রুদ্ধ হয়ে গেল?

হে বরদরাজ—হে রঙ্গনাথস্বামী—ভাষা দাও, ভাষা দাও।

লল্লা নড়েছে। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে কম্পিত পদক্ষেপে এগিয়ে আসছে। সে কাছে এসে নতজানু হয়ে বসল। চারিদিকের জনতাকে গ্রাহ্য করলে না। তিনি এবার বললেন—কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে গেছে তাঁর—বললেন—লল্লা!

সে হাত জোড় করে স্মিত হেসে বললে—আমি কল্যাণী। কন্যাকুমারিকায় দেবী কুমারী-মাতার মন্দিরের বহির্দেশ পরিমার্জনা করি—আর মাতার দৃষ্টিতে তপস্যা করি। বরদরাজকে আমার কামনা। লল্লাকে আমি জানতাম। সে সেদিন সমুদ্রজলে ডুবে মরতে গিয়েছিল। তাকে তুলেছিলেন কন্যাকুমারীর সন্ন্যাসিনী মাতা। তাঁরা নৌকোয় ফিরছিলেন পার্থসারথি দর্শন করে।

সেদিন ভোরে যখন রঙ্গনাথন চলে গেলেন তার দিকে না তাকিয়ে, তার আহ্বানে সাড়া না দিয়ে চোরের মত, তখন লল্লা প্রথম ভেবেছিল, বোধ হয় প্রহরীরা তাঁকে খুঁজতে এসেছে—এদিকে, তাদের সাড়া পেয়ে তিনি উঠে চলে গেলেন তাদের পথ রোধ করতে। তাকে বাঁচাতে। সে সভয়ে উঠে বসেছিল। নারিকেল বৃক্ষের সন্নিবেশ যেখানে নিবিড় সেখানে গিয়ে সে লুকিয়েছিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তার মনের ভয় স্থির হয়ে গিয়ে জেগেছিল সংশয় ও প্রশ্ন।

রঙ্গনাথন কাল তার সঙ্গে সমুদ্রতটে বাসর পেতে তাকে বুকে টেনে নেবার সময় বলেছিলেন—কিসের ভয়? তুমি আমার পত্নী। তুমি যাবে আপনার গৃহে।

তবে? তাহলে? বার বার—তার গলায় ঝুলছিল যে তুলসীর মালাখানি, যেখানি তিনিই পরিয়ে দিয়েছিলেন পত্নীরূপে বরণ করে, সেখানিকে সে হাত দিয়ে বার বার স্পর্শ করেছিল। এ তো তার স্বপ্ন নয়। মিথ্যা নয়। এ তো সব সত্য। তবে, তাহলে?

এর উত্তর নারীকে কাউকে দিতে হয় না। নারীর নিজের অন্তর দিয়ে দেয়।

ওঃ, তার সারা অঙ্গে রঙ্গনাথনের দেহের উষ্ণ স্পর্শ এখনও লেগে রয়েছে। তার অধরোষ্ঠে তাঁর চুম্বনের স্পর্শ অনুভব করেছে। কি আবেগ—কি গাঢ়তা সে চুম্বনে। সে ভেবেছিল তার নারীদেহ সার্থক, নারীজীবন সার্থক। সে ধন্য, সে ধন্য। সে ধন্য হয়ে গেল।

সে তাকে বলেছিল, আপনিই আমার বরদরাজ!

তিনি বলেছিলেন, তা হলে তুমিই আমার লক্ষ্মী!

সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! সব মিথ্যা! সত্য এমন করে মিথ্যা হয়ে যায়? হে বরদরাজ! চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছিল লল্লার। কিন্তু ভয়ে সে পারে নি। ভয় হয়েছিল তার নারীত্বের ব্যর্থতার লজ্জা প্রকাশের, ভয় হয়েছিল নিজের লাঞ্ছনার, ভয় হয়েছিল রঙ্গনাথনের লাঞ্ছনা হবে, জাতিচ্যুতি ঘটবে তাঁর সমাজে। কিন্তু সে কি করবে?

সূর্য উঠছে তখন। পূর্ব দিগন্তে আকাশমণ্ডল এবং সমুদ্রগর্ভে একটি রক্তানুরঞ্জিত মণ্ডল ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। এইবার একসময় ওই অনুরঞ্জন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে হতে সমুদ্রগর্ভ থেকেই যেন সূর্য লাফ দিয়ে উঠবেন আকাশলোকে। তিনি দেখবেন ওর এই লজ্জিত, কলঙ্কিত লাঞ্ছিত মুখ? ছি ছি ছি!

মর্মযন্ত্রণার ক্ষোভের আর সীমা ছিল না তার। সে ভেবেছিল মৃত্যু ভাল। সে মরবে, সে মরবে।

উন্মত্ত ক্ষোভে যন্ত্রণায় মানুষের এক-একটি মুহূর্ত আসে যখন তার মৃত্যুভয় থাকে না। পৃথিবীর ভয় বড় হয়ে ওঠে। মৃত্যু তখন পরমাশ্রয় বলে মনে হয়। সে মুহূর্তে তার কর্তব্য স্থির করে নিয়ে তার বক্ষবন্ধনীখানি খুলে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল খাড়া বালুচরের উপরে। তখন আবার জোয়ার এসেছে। বালুচরের নিচেই সমুদ্রজল গভীর হয়ে উঠেছে, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গে আঘাতের পর আঘাত হানছে।—সেখানে বসে সে নিজের পা দুটি বেঁধেছিল ওই বক্ষবন্ধনী দিয়ে। আর গলায় শক্ত করে পাক দিয়ে জড়িয়ে নিয়েছিল তুলসীর মালাটিকে—যেন খুলে পড়ে না যায়। থাক তার ওই পরিচয়—সে পরপার পর্যন্ত বহন করে নিয়ে যাবে।

সমুদ্র-জলতলে আত্মগোপনই তার ভাল। কিন্তু সে সমুদ্রতটবাসী শবরকন্যা। সাঁতার সে জানে। শৈশব থেকেই সমুদ্রের বুকে ঝাঁপ দিয়ে সে খেলা করেছে। হয়তো ঝাঁপ দিয়ে পড়েও সে সাঁতার দেবে—পালিয়ে আসবে রত্নগর্ভ সমুদ্রতল থেকে বালুচরে। সমুদ্রগর্ভে বাতাস

নেই। তাই সে বেঁধেছিল তার পা দুটো। তারপর বসে বসেই কিনারায় এসে উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপ খেয়েছিল।

ডুবেও ছিল। কিন্তু স্বাভাবিক নিয়মে খোলা হাত দুটো দিয়ে সাঁতার কেটে উঠেছিল উপরে। কিন্তু বাঁধা পায়ের জন্য আবার ডুবেছিল। আবার উঠেছিল। আবার ডুবেছিল। তারপর আর মনে নেই। জ্ঞান হারিয়েছিল সে।···

যখন চেতনা হয়েছিল, তখন সে একখানা বড় নৌকোর উপর। তার মাথার কাছে বসে এক গৈরিক বস্ত্রধারিণী সন্ন্যাসিনী।

সন্ন্যাসিনী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, সুস্থ বোধ করছ?

অবাক হয়ে তাঁর শান্ত প্রসন্ন মুখের দিকে সে তাকিয়েছিল এবং তাঁকে সে চিনতেও পেরেছিল। মাদ্রাজে পার্থসারথির মন্দিরে সে তাঁকে দেখেছে। দরিদ্রদের দান করেছিলেন। চাল দিয়েছিলেন। সাধারণ মুষ্টিভিক্ষা নয়। এক-একজনকে একদিনের আহারের উপযোগী চাল। তারপরও তাঁকে সে দেখেছে; দেখেছে তাঁকে রঙ্গনাথনের গানের আসরে। চোখ বন্ধ করে গান শুনছিলেন। শুনেছিল—কন্যাকুমারীর সন্ন্যাসিনী তিনি। গিয়েছিলেন নাকি জগন্নাথধাম, মহাপ্রভু দর্শন করতে। সেখান থেকেই ফিরছেন। পথে মাদ্রাজে নেমেছিলেন আহার্য জল সংগ্রহের জন্য, এবং তার সঙ্গে দেবতা দর্শনও করেছেন।

তিনি আবার প্রশ্ন করেছিলেন, তোমার পা এমন করে বাঁধা কেন? তুমি নিজে বেঁধেছিলে?

সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চোখ বন্ধ করেছিল, চোখের পাতার চাপে জল গড়িয়ে পড়েছিল গণ্ডদেশ বেয়ে। কথা বলতে পারে নি। ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল, হ্যাঁ।

—তা হলে মরবার জন্যই এমন করে ঝাঁপ খেয়েছিলে?

সে চুপ করে চোখ বুজে শুয়েছিল। শুধু অশ্রুই পড়েছিল গড়িয়ে গড়িয়ে।

—কেন? মরতে চাও কেন?

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। কথা বলতে পারে নি।

—আচ্ছা থাক। বলতে হবে না। তিনি আর তাঁকে প্রশ্ন করেন নি। জানতে চেয়েছিলেন পরিচয়। সে বলেছিল, সে অনাথা। মা বাপ ভাই কেউ নেই।

—স্বামী?

আবার কাঁদতে শুরু করেছিল সে।

তিনি তখন তাকে আর প্রশ্ন করেন নি।

পরে সুস্থ হলে সে ধীরে ধীরে সবই বলেছিল মাতাজীকে। শুধু রঙ্গনাথনের নাম করে নি। বলেছিল—এক ব্রাহ্মণ তাকে সমুদ্রতটে সমুদ্রকে সাক্ষী করে বিবাহ করেছিল। সাক্ষী তার এই তুলসীর মালা। কিন্তু—

আর বলতে পারে নি লল্লা।

মাতাজী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তার পর?

সে একটু ঘুরিয়ে বলেছিল, তারপর যে তিনি কোথায় চলে গেলেন!—একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, আর সন্ধান জানি না। হয়তো তাঁর সমাজ—

মাতাজী তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, সমাজ নিষ্ঠুর। শাস্ত্রও নিষ্ঠুর। মানুষের হৃদয়কে সে পাথর চাপিয়ে পিষ্ট করে দেয়। কুটিল তাদের চক্রান্ত। ঋষি দুর্বাসা চক্রান্ত করে এমনি ভাবেই এক কুমারীর তপস্যা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন কল্যাণী।

লল্লা তাঁকে তার লল্লা নাম বলে নি—বলেছিল তার নাম কল্যাণী।

মাতাজী বলেছিলেন, তিনি আজও কুমারী অবস্থাতেই স্বামীর তপস্যা করছেন—অথচ তিনি কে জান? তিনি আদ্যাশক্তি। স্বয়ং পার্বতী। কন্যাকুমারী তীর্থের নাম শুনেছ?

ঘাড় নেড়ে লল্লা তাঁকে জানিয়েছিল, হ্যাঁ—জানে।

—সেই কন্যাকুমারীতে আমি থাকি। আমিও তাঁর পূজা করি। আমিও কুমারী। বাণ অসুরকে বধ করতে দেবী পার্বতী কুমারীকন্যার রূপে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। অসুরকে বধ করে তিনি কামনা করলেন পশুপতিনাথ-মহেশ্বরকে। তিনি বিবাহ করলেন, তপস্যা করতে লাগলেন। তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতারা এসে বিবাহের লগ্ন স্থির করে গেলেন। এই লগ্নে বিবাহ হবে। দেবী সেদিন বিবাহের সজ্জায় সেজে বরমাল্য হাতে নিয়ে সজ্জিত মণ্ডপে বসে রইলেন। ওদিকে দেবতারা মহেশ্বরকে নিয়ে মর্ত্যলোকে যাত্রা করে এলেন। কিন্তু মহর্ষি দুর্বাসা চাইলেন না এ বিবাহ। সেও এই প্রশ্ন। দেবী পার্বতী হিমাচলদুহিতা উত্তরাবর্তের গৌরী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। আর এ দক্ষিণের নীলগিরি-দুহিতা, শ্যামাঙ্গিনী। দুর্বাসা চক্রান্ত করে বিবাহলগ্ন ভ্রষ্ট করে দিলেন। বিবাহ আর হল না। শিব আজও কন্যাকুমারী মন্দিরের কিছুদূরে প্রতীক্ষা করে রয়েছেন। কিন্তু সে লগ্ন আজও ফিরে আসে নি। অনন্তকাল কুমারীকন্যা তার মাল্যখানি হাতে সেই তপস্যাই করে চলেছেন।

আমি তাঁরই সেবিকা। ছোট আশ্রম আছে। আমার যিনি কাম্য তিনি পৃথিবীতে নেই। পরপারে তাঁর সঙ্গে মিলব। তিনি মহেশ্বরে লীন হয়েছেন। চল, তুমি আমার সঙ্গে চল। সেখানে থাকবে। পার তো তপস্যা করবে। যাবে?

আর যদি ফিরে আসতে চাও মান্দ্রাজ তবে মান্দ্রাজগামী নৌকোতে তোমাকে ফিরে পাঠিয়ে দেব।

লল্লার চিত্ত ভরে উঠেছিল। সে তপস্যাই বেছে নিয়েছিল।

আর সে লল্লা নয়—লল্লা মরে গেছে সমুদ্রের জলে; যে বেঁচে আছে সে তপস্বিনী কল্যাণী।

* * * *

সে শবরী। দূর থেকে সে দর্শন করেছে কন্যাকুমারীর অপূর্ব লাবণ্যময়ী সর্বালঙ্কারভূষিতা বিবাহের কন্যাবেশিনী অপূর্ব মূর্তি। মুগ্ধ হয়ে গেছে। তার সব সন্তাপ যেন মুছে গেছে।

সে মাতাজীর আশ্রমে থাকে। আশ্রমের কাজ করে। গাভীর সেবা করে। বাগানের গাছের পরিচর্যা করে।

মাতাজী বলেন—তুমি আর শবরী নও কল্যাণী, তুমি ব্রাহ্মণী। তোমার ব্রাহ্মণ প্রিয়তমের মাল্য তোমার কণ্ঠে, আচারে-আচরণে পবিত্র। কেন, দূরে থাক কেন?

লল্লা হাসে। সবিনয়ে বলে—মাতাজী, আপনার করুণাই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, ওই আমার ব্রাহ্মণত্ব। ওতে আর আমার প্রলোভন নেই। মানুষকে আমি চাই না মাতাজী—আমি চাই ভগবানকে।

মাতাজী তাকে বলছিলেন—তুমি তীর্থদর্শন কর কল্যাণী। নিশ্চয় তুমি ভগবানের দয়া পাবে। তুমি পরিপূর্ণা হয়ে যাবে।

লল্লা প্রথমেই এসেছে দোলযাত্রায় পুরী। নীলমাধব দর্শনে। বরদরাজ ও নীলমাধবে ভেদ নেই।

দোলযাত্রায় নীলমাধবকে দর্শন করে তাঁর বসন্তোৎসবের আবীর কুমকুম প্রসাদ নিয়ে ধন্য হয়েছে। জীবনে মানুষ রঙ্গনাথনের শূন্যস্থান তিনি পূর্ণ করে বসেছেন। তারপর আজ এসেছে

সে ভুবনেশ্বরে দর্শনে।

এসে দূর থেকে বিন্দু সরোবর প্রান্তে ওই পুষ্পিত মাধবীলতার তলায় রঙ্গনাথনকে দেখে প্রথমটা অবশ পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। তারপর আত্মসম্বরণ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। তপস্যাকে সে আজ পরিপূর্ণ করবে। রঙ্গনাথনের সম্মুখে হৃদয়ের দ্বারখানি বন্ধ করে দিয়ে বিদায় নিয়ে বলবে—তোমাকে নীলমাধবরূপে পেয়েছি হৃদয়ে। আর তো স্থান নেই।

সেই কথা বলতেই সে এসে নতজানু হয়ে বসে প্রণাম করে বললে—প্রভু, সন্ন্যাসিনী লল্লাকে অচেতন অবস্থায় সমুদ্র থেকে তুললেও সে বাঁচে নি। সে মরে গেছে। আমি লল্লা নই, আমি কল্যাণী। তবে লল্লা মরবার সময় এইটি আমার কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। লল্লার প্রিয়তম আপনি। আপনাকে দিতে বলে গেছে।

বলে গলার মালাগাছি খুলে তাঁর পায়ের তলায় রেখে প্রণাম করলে।

রঙ্গনাথন জড়িত কণ্ঠে আর একবার বললেন—লল্লা!

—আমি কল্যাণী। আমি আসি প্রভু।

লল্লা চলে যাচ্ছে। মালাগাছি পড়ে রয়েছে। তিনি স্থাণুর মত বসেই রইলেন।

চোখ বন্ধ হয়ে গেল তাঁর। বোধ হয় আপনা থেকেই। চোখের ভিতর জল ছলছল করছে। রঙ্গনাথন আর্তকণ্ঠে ডাকলেন, কল্যাণী!

সে আহ্বানে না দাঁড়িয়ে পারল না সন্ন্যাসিনী।

রঙ্গনাথন প্রশ্ন করলেন—চোখ থেকে তখন অশ্রুধারা উদ্গত হচ্ছে—আর্তস্বরেই বললেন—পৃথিবীর কি সবই মিথ্যা? সন্ন্যাসিনী সহসা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে না। আকাশের দিকে তাকিয়ে উত্তর খুঁজে নিয়েই বললেন—না প্রভু, সবই সত্য। বৃক্ষশাখার বৃন্তে পুষ্পকলিও সত্য—বিকশিতদল পুষ্পও সত্য। আবার বিগলিতদল ফুলও সত্য। এবার আসি। সব সত্য।

চোখ বন্ধ করেই বসে রইলেন রঙ্গনাথন। চোখ খুলতে সাহস হল না। শুধু আঙুলগুলি চলছে বীণার তারের উপর। পদশব্দ কি মিলিয়ে যাচ্ছে?

হঠাৎ মনে হল—এ কি, কি বাজাচ্ছেন তিনি?

ক্ষীণ একটি হাস্যরেখা ফুটে উঠল তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে।

এ তো বসন্ত রাগ!

মিথ্যা কথা। জীবনে বসন্ত রাগ একবার আসে। তারপর সে চিরদিনের মত মিথ্যা হয়ে যায়। শুধু রেশ—না, রেশও থাকে না, থাকে স্মৃতি। লল্লা মিথ্যা হয়ে গেছে—সত্য হয়ে উঠেছে কল্যাণী। না, সেও না। সত্য এক তপস্বিনী। তাকে দেখে স্মৃতিবিভ্রমে বসন্ত রাগ বেজে উঠেছে আঙুলে। বাজুক। চোখ বুজে বাজাতে লাগলেন। হঠাৎ কানে গেল—প্রভু!

চোখ মেললেন রঙ্গনাথন। দেখলেন লল্লা ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে। মুখের দিকে তাকালেন রঙ্গনাথন। বীণায় বসন্ত রাগ বেজে চলেছে। থামবার উপায় নেই। লল্লা বললে—মালাগাছি—ও গাছি আমি ফিরে চাচ্ছি প্রভু। লল্লা মরেছে—তার আত্মা ফিরে চাচ্ছে। ওতেই সে বাঁধা আছে প্রভু।

বলে মালাগাছি সে তুলে নিয়ে চলে গেল। বসন্ত রাগ অকস্মাৎ যেন বীণার তারে জীবন্ত অবস্থায় বাজতে লাগল।